৪০ বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

সূচিপত্র

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
স্মারক বক্তৃতা	গৌতম মিস্ত্রী	৫
নিরীশ্বর বোধোদয়	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১৩
উৎস মানুষ ৪০	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	১৫
চিকিৎসক-রোগী সম্পর্ক	অরুণালোক ভট্টাচার্য	১৬
মহাকর্ষসূত্র মন্ত্রী কথন	সুশান্ত মজুমদার	২০
চীনকে ঠেকাতে	শৈবাল কর	২২
দৃষ্টান্ত খাপ পঞ্চায়েত	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৪
দেদার নম্বর	নন্দগোপাল পাত্র	২৬
না ধার্মিক আলোচনা	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৮
বিদ্যাসাগর স্মরণ		২৯
অসুখ ডিজে		৩০
চিঠিপত্র		২১
সংগঠন সংবাদ		৩২

প্রচ্ছদশিল্পী: দেবাশিস রায়

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৮৯০২৪১২২৯০/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

পায়ে পায়ে চল্লিশে

সমুদ্রের ঢেউ ওঠে আর মিলিয়ে যায়। দু-একটা ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর ভবিষ্যৎও তাই। মহা উৎসাহে শুরু হয়, তারপর লেখা মেলে না, বিজ্ঞাপন মেলে না। প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কখনও দল ভাঙে। শেষে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক বড় বড় পত্রিকাও পাঁচ-দশ বছর চলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন উদাহরণও ঢের মেলে। এই অবস্থায় উৎস মানুষ পত্রিকা চারটে দশক কাটিয়ে দিল স্বমহিমায়। সর্বোপরি এতে না আছে চটকদার গল্প, কবিতা, না খেলা বা সিনেমা বিষয়ক আলোচনা। তার ওপর বিজ্ঞাপন প্রায় নেই। তাতে কি! শুধুমাত্র বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতিকে আঁকড়েই সে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে এগিয়েছে। আশি-নব্বইয়ের দশকে গোটা রাজ্যেই হয়ে উঠেছে আলোচ্য। বিজ্ঞান আন্দোলনের অলিখিত পুরোধা। উৎস মানুষ পত্রিকাকে ঘিরে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে পাঠচক্র, কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন। যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন করেন, একমাত্র তাঁরাই টের পাবেন ৪০টা বছর একটা পত্রিকাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কী কঠিনস্য কঠিন।

১৯৮০-র জানুয়ারিতে 'মানুষ' নামে আত্মপ্রকাশ। সেই নাম নথিভুক্ত হতে পারে না। তাই ৮১-র জানুয়ারিতে আবির্ভাব 'উৎস মানুষ'-এর। 'মানুষ' থেকে ধরলে পত্রিকা চার দশক পার করে ফেলেছে। পত্রিকার স্লোগানটি ছিল নজরকাড়া— 'সব কিছুতেই খুঁজব কারণ, অন্ধভাবে মানব না/ বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায়, বন্দী করে রাখব না।' এই দর্শনই প্রতিফলিত হয় প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের এক অসাধারণ গানে—

'প্রশ্ন কখনও হয় না শেষ।
কি, কেন, কোথায়, কী করে, কখন?
প্রশ্নের ঢেউ ছুটছে।
উৎস থেকে মোহনা, আবার
মোহনা থেকে উৎসে।...
চোখে তার জ্বলে জিজ্ঞাসা
হাতে যুক্তির তরবারি,
ভয়েতে পালায় মিথ্যার আর
মৃত্যুর কারবারি।...
নির্ভয় রণজয়ী মানুষের
প্রশ্ন কখনও হয় না শেষ।'

পরের পাতায়

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ কলকাতার গোখেল রোডে স্যার আর এন মুখার্জি প্রেক্ষাগৃহে উৎস মানুষ-এর দশম বর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ গান রচনা করেছিলেন প্রতুল। নিজের সুরে গেয়ে শুনিয়েওছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞান-চেতনা বা বৈজ্ঞানিক মেজাজের কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। বিজ্ঞানী না হয়েও কেউ কেউ বিজ্ঞানের স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারেন।'

যে কোনো নির্মাণ দাঁড়িয়ে থাকে তার শক্তপোক্ত ভিতের উপর। সেই ভিতটা হল সমাজকে বদলের তীব্র জেদ। বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের, উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসের, প্রথা বা রীতির নামে যে সামাজিক অসাম্য, বঞ্চনা চলেছে চারিদিকে তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া, মানুষকে সচেতন করা, আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল লক্ষ্য। 'মানুষ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই তাই লেখা হয়েছিল— 'বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক চেতনা, যুক্তিনির্ভরতা আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার কাজে বিজ্ঞান কোন ভূমিকা পালন করছে? বলা যায় প্রায় নিষ্ফলা, বন্ধ্যা। তা না হলে এই বিংশ শতাব্দীর সাতটা দশক পার করেও কেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেশিরভাগ মানুষ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অদৃষ্টবাদ আর অতীন্দ্রিয়বাদের শিকার হয়? হাঁচি টিকটিকি অশ্লেষা মঘা মানত কিরের কথা বাদ দিচ্ছি, প্ল্যানচেট জন্মান্তরবাদ মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক কবচ তাবিজ— এইসব কেন অনায়াসে বিশ্বাস করি আমরা প্রমাণটমান ছাড়াই? কোন বৈজ্ঞানিক কারণে বহু ডিগ্রিধারী প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর হাতেও পলা নীলা পোখরাজ ধারণ করা থাকে?...'

সেই চার্বাক থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়রা— এককভাবে চেষ্টা করেছেন। সেই অগ্রপথিক, সেই প্রমিথিউসদের আগুন হাতে নিয়েই সঙ্ঘবদ্ধভাবে পথ চলতে থাকে উৎস মানুষ। দশম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় তাই সে সপ্রত্যয় লেখে—

'সেইরকমই অনড় হলো ধর্মবিশ্বাসের দুর্গ। অন্ধ, বদ্ধ, স্থবির। সেখানে জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন নেই, প্রমাণ চাইবার সুযোগ নেই। ঐতিহ্য আর সনাতনের প্রতি অন্ধ ভক্তি, রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য— সেখানেও যেন একই বদ্ধতার আভাস। ধর্মের নির্দেশ আর তত্ত্বের আরোপণ— মৌল চরিত্রে কি এক নয়? এক অমোঘ অচলায়তনের নিগড়ে বেঁধে রাখছি নাকি আমরা আমাদের মনকে, চেতনাকে, অভ্যাসকে?... ভাঙতে গেলে, নাড়াতে গেলেই হাজারো দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিভ্রম। কিন্তু শুরু তো এটাই। ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ— এই নিরন্তর দীর্ঘমেয়াদী লড়াই-এর সূত্রপাতে ক্ষুদ্র কাজটা আদৌ ক্ষুদ্র নয় ...'।

দু দশক কেটে যাওয়ার পর একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, তা এই ২০২০ সালেও সমান সত্য। লেখা হয়েছিল—

'কুড়ি বছর হয়ে গেলো। এখন কার্তিকের মাসে ধানের ছড়ার পাশে রাসায়নিক বিষ। অনেক নরম নদী শুকিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সোনালি ডানার চিল। কেউ তারা আর ফিরে আসে না। প্রকৃতির, সমাজের, মানুষের দিকে বিশেষ কেউ আর তাকাতে চায় না। তবু...। ...এই অমূল্য প্রেরণাশক্তির জোগান আসে গ্রামগঞ্জ মফঃস্বলের... কিছু আশাবাদী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমাজসচেতন মানুষের থেকে। এঁদেরই তাড়না কিংবা প্রেরণায় উৎস মানুষের থেমে যাওয়া আর হয় না। নতুন শতাব্দীতে চলা শুরু হয় ফের, নতুন আঙ্গিকে, নতুন সময়ের মুখোমুখি হতে। অতএব... চরৈবেতি। চরৈবেতি।'

এই ২০০০ সাল থেকে নানা কারণে পত্রিকার চলায় ছন্দপতন হয়। মাসিক পত্রিকা দ্বিমাসিক হয়। ২০০৪-০৫-এ প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। যদিও কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। চালু হয় 'নেট সংস্করণ'। এই পর্বেই প্রয়াত হন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পর আবার কয়েকজনের মিলিত উদ্যোগে ২০০৯ জানুয়ারি থেকে পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসাবে নিয়মিত বেরোচ্ছে। ওয়েবসাইট ছিলই, ফেসবুকের যুগে পত্রিকা সেখানেও হাজির। বইমেলায় যোগ দেওয়াতে অবশ্য কখনই ছেদ পড়েনি। চাহিদার কারণে পুরোনো বই বারবার ছাপতে হচ্ছে। সঙ্গে অব্যাহত নতুন বইয়ের প্রকাশও। পত্রিকার প্রচ্ছদ ও আঙ্গিকে পরিবর্তন আগেও হয়েছে এই সংখ্যাতেও হল। চল্লিশে চালসে নয়, আমরা পূর্ণ উদ্যমেই ছুটতে চাই। তাই অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সহৃদয় পাঠকরা, শুধু আমাদের পাশে থাকুন।

উমা

বইমেলায়
উৎস মানুষ
স্টল নম্বর ৪৭৯

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

পর্ব ১০

রসুলান বাই আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আশীষ লাহিড়ী

পেঁয়াজের দাম দেড়শো টাকা ছোঁয়ার পর টাকাপয়সার বেশ টানাটানি দেখা দিয়েছে। পিঁয়াজি, দোপিঁয়াজি ছাড়া বাঁচব কী করে! একমাত্র উপায়, বাড়তি রোজগারের ধান্দা করা। পিঙ্ক বলের সঙ্গে মিশরি পেঁয়াজের সাদৃশ্য আছে কিনা, এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সৌরভের দাদাগিরি দেখে মনে সাধ জাগল, আমিও সাইড ইনকাম বাড়ানোর জন্য কুইজমাস্টার হব। তবে অন্য কায়দায়। একটা দিয়ে শুরু করে ধাপে ধাপে অন্য অনেক প্রশ্নে পৌঁছব, তারপর সব মিলিয়ে মেগা-স্কোর জানাব। তারপর জব্বর একখানা জ্যাকপট প্রাইজ দেব।

প্রথম প্রশ্নটা ভেবে ফেলেছি: 'রসুলান বাই আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে কোথায় মিল?'

লিখেই খেয়াল হল, সেরেছে! দিনকাল যা, তাতে রসুলান বাঈ কে, প্রথমে সেটাই তো ব্যাখ্যা করা দরকার। তাঁর তো আর জন্মের দ্বিশতবর্ষ চলছে না যে, বাঙালি তাঁর খবর রাখবে। ঠিক আছে, আন্তর্জালের ইন্দ্রজাল থাকতে পরোয়া কি! রসুলান বাই ছিলেন হিন্দুস্তানি মার্গ সঙ্গীতের এক মস্ত শিল্পী। ১৯৫৭ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। প্রবাদপ্রতিম কেসরবাই কেরকার-এর পর সেই প্রথম এক মহিলাশিল্পী ওই পুরস্কার পান। বেনারসের পুরব অঙ্গের ঠুমরি আর টপ্পার জাদুকরী ছিলেন তিনি। কলকাতার সিংহি পার্কে রসুলানের একটি মেহ্‌ফিলের বর্ণনা: 'রসুলান যখন গান ধরলেন, সমস্ত লোক শান্ত হয়ে গেল। ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে শুধু মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ।... এমন মিষ্টি রসুলানজীর গলা এবং সমুদ্রের মতো গম্ভীর, গলার সুরে এমন উদাস ভাব। ঐ উদাস গলার মধ্যে থেকে 'নজাকৎ'; মাঝে মাঝে 'নখরা'; বের করছিলেন...। ঠুম্‌রী গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গানের মধ্যে 'নখরা' বা রঙ-ঢং, মাঝে মাঝে গর্বিত ভাব, মাঝে মাঝে রাগের ভাব থাকবে...। রসুলানজী এইসব হাল্কা জিনিসগুলো ওই গম্ভীর গলায় গাইছেন, অথচ তাঁর গলার আওয়াজটাই দিগন্তের মতো উদাসী...।' কিছুটা কি আন্দাজ পাওয়া গেল ওই গলার জাদুর?

রসুলান বাই

রসুলান বাই (১৯০২-১৯৭৪)

এবার প্রসঙ্গটাকে জটিল করে তোলা যাক। জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে গঙ্গার ঘাটে মছলি বাবার পাশে বসে এক মহিলা ভজন গেয়েছিলেন, মনে আছে? প্রশ্ন: ভজন-গায়িকার নাম কী? এটা কুইজের ক্লু-ও বটে, উপ-প্রশ্নও বটে। এটা বাঙালি জানে। গায়িকার নাম রেবা মুহুরী। বেশ। এবার কুইজের উপ-উপ-প্রশ্ন: রেবা মুহুরীর বাবা কে? ক্লু: তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন, মুহুরী ছিলেন না। এ প্রশ্নটা কেবল যাটোর্ধ্ব বাঙালিদের জন্য সংরক্ষিত। ঠিক উত্তর দিলে ডোভার লেনের দুখানা টিকিট বিনামূল্যে। কেননা নরেন্দ্র সিংহীর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত আগেকার ওই সিংহী পার্ক সঙ্গীত সম্মেলনেরই বর্তমান নাম ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স।

রেবা মুহুরী (১৯৩০-২০১১)

একজন খুনখুনে বৃদ্ধ হাত তুলে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেলেন' 'পাঁচুদা।' অ্যাঁ, সে কি কথা! পাঁচুদা, মানে পাচু রায় তো জানি সাউথ দমদম মিনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান! তিনি রেবা মুহুরীর বাবা হবেন কি করে! বৃদ্ধ রহস্য সমাধান করে দিলেন: 'রেবা মুহুরীর বাবার নাম অমিয়নাথ সান্যাল। ডাক নাম পাঁচু। কৃষ্ণনগরের লোকে, গানাবাজনার জগতের লোকেরাও, তাঁকে ডাক্তারবাবু বা পাঁচুবাবু বলে ডাকত।' তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সঙ্গীতে তাঁর চেয়ে গুণী লোক খুব বেশি জন্মাননি। তার ওপর ছিল কলম। সুরের কথা কালিকলমে এমন করে আর কে লিখেছেন! সুখের কথা, তাঁর লেখা 'স্মৃতির অতলে'; এখনো যাটোর্ধ্ব বাঙালিদের স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। তো, রেবা মুহুরী বাবার ধাত পেয়েছেন। ঠুমরী (তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, উচ্চারণটা 'ঠুংরি' নয়, ঠুম্‌রী) গানে তিনি বিশেষজ্ঞা, বিশেষ করে বেনারস

প্রবীণা রেবা মুহুরী

অঙ্গের ঠুমরীতে। সাধে কি আর সত্যজিৎ বেনারসের পটভূমিতে তাঁকে দিয়েই গাইয়েছিলেন! তার ওপর তিনি লেখকও বটেন। বাঈজীদের সঙ্গীতসাধনা ও জীবন নিয়ে অসাধারণ কিছু লেখা আছে তাঁর। তেমনই একটি বইয়ের নাম 'ঠুমরী ও বাঈজী' (প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১০)। সে বইতে রসুলান বাই, বড়ী মোতিবাই, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, দুর্গেশনন্দিনী বাই প্রমুখ 'গান্ধর্বী'দের (শব্দটা অমিয়নাথের খুব প্রিয় ছিল) সঙ্গীত ও ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী কিছু কলমচিত্র এঁকেছেন রেবা। ওপরে রসুলান বাইয়ের গানের যে বিবরণ দিয়েছি, সেটা তাঁরই বই থেকে।

তো, সেই বইয়ের ২৬–২৭ পৃষ্ঠায় রসুলানজীর 'জীবনদর্শন' সম্বন্ধে লিখেছেন রেবা: 'এই যে আমার এতবড়ো সম্পদ, আমি এর জন্য গর্বিত। যদি কখনো মরেও যাই, তবু কারো কাছে মাথা নিচু করব না।... এমনকি পেটের জন্যও আমি কারো কাছে মাথা নিচু করব না।' ফল? 'তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর দারিদ্র্য চরম।... কিন্তু তিনি কারো কাছেই অর্থসাহায্য চাননি। শেষ বয়সে রসুলানজী অনেক শিক্ষিত ও পয়সাওলা বাড়ির মেয়েদের গান শেখাতেন। কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সবই ছেড়ে দেন। অথচ একটু মানিয়ে নিতে পারলেই তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হত না। কিন্তু এটাই তাঁর চরিত্রে ছিল না। তাই বিখ্যাত রসুলানজী যখন পক্ষাঘাতে অসহায়ভাবে হাসপাতালে মারা যাচ্ছেন, তখন তাঁর দেশের একজন মানুষও তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়নি।'

রেবা মুহুরী যৌবনে

রেবা ব্যাখ্যা করেছেন: 'রসুলানজীও ভাগ্য মানতেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর যদি থাকতেন, তাহলে আমি না–খেতে পেয়ে মারা যাব কেন? কেন আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা দুটো রুটির কথা ভাবতে হবে? আমি কি কোনো অপরাধ করেছি?... ঈশ্বর কোনো দোষ করল না এরকম একজন বেগুনাহ্ (নির্দোষ) লোককে এই শাস্তি দিলেন— আর একজন জীবনে কোনো কষ্ট করল না, ঈশ্বর তাদের কত সুখে রেখেছেন! তুমিই বলো বেটি, এই ঈশ্বরকে আমার কিসের প্রয়োজন? এরকম একজন একচোখো ঈশ্বরকে আমার কোনো দরকার নেই।'

'বাঈজী সাহেবা, নিজে দুঃখ পেয়েছেন বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছেন। আমি কিন্তু অন্যে দুঃখ পেয়েছে বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম।'

—বিদ্যাসাগর

এইবার আমরা কুইজের সঙ্কটজনক পর্বে প্রবেশ করছি। প্রশ্ন: 'এই ঈশ্বরকে আমার কিসের প্রয়োজন? এরকম একজন একচোখো ঈশ্বরকে আমার কোনো দরকার নেই'— এই উক্তির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন উক্তির মিল আছে? এবং তিনি কোথায়, কখন, কবে সে উক্তি করেছিলেন? ঠিক উত্তর দিতে পারলে পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহ যাওয়ার দুর্লভ সুযোগ আপনার করায়ত্ত— কিংবা পদায়ত্ত।

কুইজ শুটিংয়ের এই পর্যায়ে পৌঁছে হঠাৎ ফ্লোরের মাঝখান থেকে গোঁ–গোঁ করে একটা শব্দ হল। দেখি, ক্যামেরাপার্সন মূর্চ্ছা গিয়েছেন। সেদিনের মতো 'প্যাক–আপ' বলে যে যার পেঁয়াজ–দক্ষিণা নিয়ে বাড়ি চলে গেল। অনেক পরে শেষরাতে বাদুড়বাগান থেকে হোয়াট্‌সঅ্যাপে এক উড়ো মেসেজ এল: 'বিদ্যাসাগর অভিমান করে বলেন, ঈশ্বরকে ডাকবার আর কী দরকার! দেখ চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাঠ আরম্ভ করলে, তখন অনেক লোককে বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে কি করা যায়; ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল!

এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো উপকার হল না।' (১৮৮২–র ১৪ ডিসেম্বর, শ্রীম, কথামৃত, ১:১৪৪, উদ্বোধন, ১৯৯৬)।

বুঝলাম, বিদ্যাসাগরের অশরীরী আত্মা রুষ্ট হয়ে আমার কুইজ–পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছেন। যদ্দূর খবর পেয়েছি, রসুলানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'বাঈজী সাহেবা, নিজে দুঃখ পেয়েছেন বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছেন। আমি কিন্তু অন্যে দুঃখ পেয়েছে বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম।'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, সিংহী পার্ক আর বাদুড়বাগান সমেত কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। সাধে লোকে বিদ্যাসাগরের দর্শনকে 'কাণ্ডজ্ঞানের দর্শন' বলে?

একাদশবর্ষ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

প্রযুক্তি যতই থাক, নাড়ি-টেপা ডাক্তারি হেলাফেলার জিনিস নয়

গৌতম মিস্ত্রী

আজ থেকে ৪০ বছর আগের কথা দিয়ে শুরু করি। সময়টা ১৯৭৮ সাল, আমি বছর উনিশের যুবা। শহরতলির এক গ্রামের সরকারি স্কুল থেকে কলকাতায় এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি। বাড়িতে হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করতাম। সেখান থেকে একলাফে বিজলি বাতির হস্টেলে চলে এলাম। জীবনদর্শন আর চিন্তাধারা তখন অনেকটা কাঁচা মাটির দলার মতো, যে যা বলে হাঁ করে শুনে যাই। আমার সৌভাগ্য, সেই সময়ে আমার কিছু সাধুসঙ্গ হয়েছিল। হোস্টেলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গগুণে ও যৌথ প্রচেষ্টায় এই সময়ে দুটো পত্রিকা পড়তাম— 'সায়েন্স টুডে' (এখন বন্ধ হয়ে গেছে) আর 'উৎস মানুষ'। ক্রমে উৎস মানুষ আমার কাছে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। আমার ব্যক্তিগত মননের, চারপাশের পৃথিবীর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গির যেটুকু নির্মাণ ও পরিণতি, তার জন্য আমি উৎস মানুষ পত্রিকাকে স্মরণ করি। সেই কিশোর বয়সে এটা কল্পনায় আনা অসম্ভব ছিল উৎস মানুষ নামের এক প্রতিষ্ঠান–নিরপেক্ষ, নির্ভীক, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা হিসাবে যিনি প্রণম্য, সেই মানুষটির স্মারক বক্তৃতায় আমি শহরের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী মানুষদের সামনে কোনো একদিন আমার কথা বলতে পারব।

আজ চিকিৎসা পরিষেবার বাণিজ্যায়নের সন্ধিক্ষণে, এই পরিষেবায় সনাতন, বিলীয়মান অথচ বহু–পরীক্ষিত, সস্তা ও চটজলদি পন্থার স্বপক্ষে আমার উপলব্ধির কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। প্রচুর শব্দক্ষয় আর বিতর্ক করতে হয় বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পক্ষে আর অবৈজ্ঞানিক— যেমন, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, রেইকি, আকুপাংচার ইত্যাদি চিকিৎসার বিপক্ষে। আজ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসারই কাটাছেঁড়া করতে হবে। কারণ, কেবল বৈজ্ঞানিক তকমা পেলেই সেটা স্থান–কালের অনুমোদন পায় না। বিজ্ঞানের জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা জরুরি।

এখন আমি বুড়ো, মানে প্রবীণ হয়েছি। প্রবীণদের বোধহয় সর্বকালের একটা আক্ষেপ, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম। ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও সেটা খাটে। অর্থাৎ জেনারেশন–গ্যাপ বা প্রজন্মের ব্যবধানগত দৃষ্টিকোণ থেকে ডাক্তারি দু রকমের— পুরাতন ও সনাতন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 'নাড়ি টেপা ডাক্তারি' আর 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডাক্তারি।' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি এগোবেই, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই কাম্য। এ দুটো উপায় একটা বিস্তারের বা স্পেকট্রামের দুটো বিপরীত বিন্দু। এর মধ্যে ভারসাম্য রেখে এক অবস্থান খোঁজা দরকার।

থার্মোমিটার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম যন্ত্র:

আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমের দিকের চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসের দুটো ঘটনা মনে করে নিই। চিকিৎসাশাস্ত্র সবে তার ঝাড়ফুঁকের অপরিণত দশা থেকে বিজ্ঞানে উন্নীত হবার চেষ্টা

করছে। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৭১৭ সালে, আমস্ট্রাডামের ড্যানিয়েল ফারেনহাইট একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যেটা দিয়ে প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা মাপা যেত। সেটাই প্রথম থার্মোমিটার, এবং প্রথম দিকের চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রও বটে। তিনি সেটি তার পরিচিত এক ডাচ্ চিকিৎসক হারমান বোরহাব–কে (Harman Boerhaave) দেন। মনে রাখতে হবে, তখনও জ্বরের কারণ হিসাবে জীবাণুর সংক্রমণের কথা মানুষ জানে না বা অনুমানও করেনি।

যাই হোক, চিকিৎসক হারমান বোরহাবের সেটা পছন্দ হয়ে যায়। তিনি রুগীর জ্বরের মাত্রা সংখ্যায় প্রকাশ করে মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নির্ণয় করা শুরু করেন। এই যন্ত্রটি তখন চিকিৎসক মহল সাদরে গ্রহণ না করলেও পরে সেটা হাসপাতালে নিয়মিত পরীক্ষার অঙ্গ হয়ে যায়। পরের দিকে অনেক পরীক্ষার মতো এটির ব্যবহারও চিকিৎসককে করতে হত না— নার্সরা করতেন। তবে এখন এই যন্ত্রটির ব্যবহার প্রায় বিলুপ্তির পথে। এখন অনেক উন্নতমানের পরীক্ষা–নিরীক্ষা ডাক্তারদের হাতের মুঠোয়। পাতি থার্মোমিটারের উপরে আধুনিক ডাক্তাররা ভরসা করেন না।

তাপমাত্রার সংখ্যাও আজ অবহেলিত। 'জ্বরের মাত্রা কত?' এই তথ্যটা এখন আর ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন কোনো ডাক্তার তাঁর চেম্বারে থার্মোমিটার ব্যবহার করেন বলে মনে হয় না। জ্বরের মাত্রার চেয়ে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ আছে কি নেই এই গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) মূল্যায়নটাই মুখ্য, তাপমাত্রার পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) মূল্যায়ন অনেকটাই গৌণ হয়ে গেছে। আমরা জানি, মারাত্মক জীবাণুর প্রবল সংক্রমণে, বিশেষ করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপদসীমার নীচে নেমে গেলে জ্বরই হয় না।

জীবাণুর সংক্রমণ আছে কিন্তু জ্বর নেই— কেবল এই তথ্যটাই শারীরবিজ্ঞানের এক জটিল সূত্রের ইঙ্গিত করে, যেটার সমাধান তেমন করে না হওয়ার জন্য ডাক্তারদের, তা সে যতই বিজ্ঞ হোন না কেন, তাঁদের কর্মজীবনের শেষ দিনটি অবধি 'প্রাকটিস' নামের এক আত্ম–অনুশীলনের প্রক্রিয়া জারি রাখতে হয়।

প্রযুক্তিকে অবশ্য প্রশ্ন করা সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর, অর্থাৎ চিকিৎসা পরিষেবার বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্তির সময় থেকেই শুরু হয়ে গেছে। যখন জ্বরের কারণ নির্ণয় ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অনুসন্ধান চলছে, রোগজীবাণুর ধারণাও মানুষ জানতে পারেনি, ফরাসি চিকিৎসক জ্যাঁ শার্ল গ্রিমুড (Jean Charls Grimaud) বললেন, 'জ্বর আছে'— এটাই অসুস্থতার লক্ষণ, এটাই যথেষ্ট, এটা নিজেই একটা বড় সমস্যা। থার্মোমিটার দিয়ে তাকে মেপে, সেটাকে সংখ্যায় প্রকাশের অবনমনের প্রচেষ্টা আসলে প্রচেষ্টার অপচয়। সেই সময়ের ডাক্তারদের মূলস্রোতের ধারণাটাই তিনি বললেন, 'বহু বছর ধরে ডাক্তারের স্পর্শ জ্বর সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে সেটা থার্মোমিটার নামের একটা যন্ত্র সেটা পারে না।

গবেষক চিকিৎসকেরা অবশ্য থেমে ছিলেন না, বললেন, কম জ্বর, বেশি জ্বর, মারাত্মক বেশি জ্বর এই ব্যক্তি–অনুভূত শব্দের চেয়ে জ্বরের মাত্রা ব্যক্তি–নিরপেক্ষ সংখ্যায় প্রকাশ জরুরি। তাঁরা বললেন, পাল্‌স রেট যদি আনুমানিক কম বা বেশি এই শাব্দিক প্রকাশের উপরে ভরসা না করে, তার গোনাগুনি করা মান্যতা পায়, তবে থার্মোমিটারই বা কেন ব্রাত্য হবে?

এর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে থার্মোমিটারের এই বিতর্ক চাপা পড়ে গেল। রোগের কারণ হিসাবে রোগজীবাণুর অস্তিত্ব জানা গেল। ক্রমে উদ্ভাবন হল রক্তপরীক্ষা, এক্স রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, পেট স্ক্যান, এন্ডোস্কোপি, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, আঞ্জিওগ্রাফি...।

চিকিৎসার লক্ষ্য হয়ে পড়ল রোগের কারণ নির্ণয় করা। চিকিৎসা–প্রযুক্তি এত বিস্তার লাভ করল যে, কোনো একক চিকিৎসকের পক্ষে সম্পূর্ণ মানবদেহের রোগের চিকিৎসার ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এখন কেবল বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অথবা একটি অঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের চিকিৎসা করার প্রশিক্ষণ নিয়ে তা প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন আস্ত চোখের ডাক্তার অর্থাৎ অফ্‌থাল্মোলজিস্ট নয়, রেটিনা বিশেষজ্ঞও আছেন। পাতি কার্ডিওলজিস্ট নয়, ইলেক্ট্রোফিজিওলজি বিশেষজ্ঞও আছেন।

মনে পড়ে, ১৯৮২ সালে ডাক্তারি পাস করে ইন্টার্নশিপ করছি। মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ও তার অধীন অন্যান্য বিভাগের মধ্যে হৃদরোগ বিভাগে ও সদ্যনির্মিত 'আইসিসিইউ'–তে হাত পাকাচ্ছি। এই আইসিসিইউ আবার তখন সমস্ত মেডিকেল কলেজের মধ্যে একমাত্র আইসিসিইউ— তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধন করেছিলেন। মেডিসিন ও তার অধীন সমস্ত বিভাগে ব্যবহারের জন্য তখন একটাই ইসিজি মেশিন ছিল, ইমার্জেন্সি বিভাগে সেটি বেশি ব্যবহার হত। তা একদিন বিগড়ে গেলে হৃদ্‌রোগ বিভাগের প্রধানকে জানাতে তিনি বললেন ইসিজি ছাড়াও হার্টের রোগের চিকিৎসা করা যায়। সেটুকু করো। সেটা এক ধরনের নাড়ি–টেপা ডাক্তারি বটে।

শিক্ষানবিশি পর্ব চলাকালীন আর এক রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে একজন হার্ট ব্লকের রুগী এলেন, তাঁকে বাঁচাতে গেলে তৎক্ষণাৎ একটা পেশমেকার বসানো দরকার। সব সময়ে ব্যবহারের জন্য আমাদের মতো জুনিয়ার ডাক্তারদের হাতের নাগালে তখন 'সি আর্ম' (C-Arm) নামক বিশেষ ধরনের এক্স–রে মেশিন ছিল না। পেশমেকারের বিদ্যুৎবাহী তার রুগীর শরীরে ঢোকানোর সময় তার সঠিক প্রতিস্থাপনের জন্য এটা লাগে।

প্রতিস্থাপনের সময়ে 'সি আর্ম' যন্ত্রের পর্দায় বুকের খাঁচার মধ্যে

হার্টের অবস্থিতি ও বিদ্যুৎবাহী তারের সচল ছবি দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের সঠিক জায়গায় বিদ্যুৎবাহী তারটিকে প্রতিস্থাপন করা হল কিনা সেটা বোঝা যায়। আমরা তখন রুগীর হাতের শিরা ফুটো করে পেসমেকারের lead বা বিদ্যুৎবাহী তার ঢোকাচ্ছি, আর প্রতিপদে ইসিজি পরীক্ষা করে দেখছি, হার্টে কখন পেশমেকারের স্পন্দন ধরা পড়ে। যাই হোক 'সি আর্ম' যন্ত্রের বদলে ইসিজি যন্ত্র দিয়ে সেটা কোনো মতে করে ফেললাম। বেশি সময় লাগল, তবে মানুষটি নিশ্চিতভাবে যমের দুয়ার থেকে ফিরে এলেন। সেটাই আমাদের কলেজের মেডিসিন বিভাগে প্রথম আপৎকালীন পেশমেকার প্রতিস্থাপন। সালটা ১৯৮৩। তখন সার্জারি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে অবশ্য কালেভদ্রে আগের থেকে পরিকল্পনা করে অধ্যাপকেরা পেশমেকার প্রতিস্থাপন করতেন। সার্জারি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে 'সি আর্ম' মেশিন ছিল ও সেটা রাতে বন্ধ থাকত। এখনও দেশের অনেক জায়গায় সি আর্ম নেই। নাড়ি-টেপা ডাক্তারি জানা থাকার এটা একটা সুবিধা। আমরা যেভাবে সেদিন সেটা করেছিলাম, মানে ইসিজি মেশিন দিয়ে পেশমেকারের তারের প্রতিস্থাপন— এটা এখন করার উপায় নেই, অনুমোদনও নেই। মরণাপন্ন রুগীর জন্য নাড়ি-টেপা ডাক্তাররা তাঁদের উদ্ভাবনীশক্তি ব্যবহার করলে তখন কেউ মানা করতেন না। এখন বিচারবিভাগের সক্রিয়তায়, রুগীদের গুগল-লব্ধ জ্ঞানের রক্তচক্ষুতে এমনটা করা মনে হয় অসম্ভব।

মেডিকেল কলেজের আমার প্রশিক্ষণের সেই সময় থেকে এর মধ্যে ৪০ বছর পেরিয়ে গেছে। ভেবে নিন, আমরা চিকিৎসা-প্রযুক্তির অগ্রগতির এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। সচ্ছল ও উৎকণ্ঠিত রোগী চাইছেন, তাঁর রক্তপরীক্ষা, এক্স রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, পেট স্ক্যান, এন্ডোস্কোপি, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, আঞ্জিওগ্রাফি ইত্যাদি সব রকমের পরীক্ষা হোক— যেটাকে চলতি ভাষায় 'হোল বডি চেকআপ' বলে থাকেন অনেকে। ডাক্তার তাঁকে খামোখা ছোঁয়াছুঁয়ি কেন করবেন, কেনইবা তাঁর নাড়ি টিপবেন! তবে সেই আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগের চিকিৎসায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যের বোঝা বিশাল, ডাক্তারের মগজের কাছে সেই তথ্যভাণ্ডারই একটা বোঝা। কম্পিউটার লাগে তার বিশ্লেষণে ও পরবর্তী নিদানে। ডাক্তার নামক মানুষটি সেখানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে কি?

ডাক্তারির স্নাতক পর্যায়ের প্রশিক্ষণের প্রাক্কালে প্রথমেই এক প্রণম্য শিক্ষক বলেছিলেন এক আপ্তবাক্য—

'রোগীর কষ্টের বিবরণ শুনে ৮০ শতাংশ রোগনির্ণয় করে ফেলা যায়, বাকি ২০ শতাংশ শারীরিক পরীক্ষায়। তোমার মগজ তোমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। ল্যাবরেটরির পরীক্ষা কেবল তোমার রোগ-অনুমানের নিশ্চয়তার জন্য, যদি তোমার ভরসার অভাব থাকে।' তখন আমরা যে সব শিক্ষককে পেয়েছিলাম, তাঁরা বিলুপ্ত হয়ে গেছেন।

স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন:

থার্মোমিটার আবিষ্কারের পরে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রযুক্তিতে পরবর্তী যুগান্তকারী উদ্ভাবন হল স্টেথোস্কোপ। মেডিকেল কলেজে যেটার ব্যবহার শুরু করলেও সেটাকে কাজে লাগানোর মতো শিখতে বহু বছর লেগে গেল। মেডিকেল কলেজে সেটা ব্যবহারের চেয়েও বেশি করে গলায় ঝুলিয়ে গর্বের ধ্বজা ওড়াতাম। এখনকার ভাষায় বলতে গেলে কেতা মারতাম।

থার্মোমিটার আবিষ্কারের প্রায় ১০০ বছর পরে, ১৮১৬ সালে প্যারিসের চিকিৎসক রেনে লেনেক (René Laennec, ১৮৬১) সেই সময়ের প্রথা— রুগীর বুকে কান পেতে হৃদয় ও ফুসফুসের শব্দ শোনায় অস্বস্তি বোধ করেন। বদলে একটি নল ব্যবহার করেন, সেটাই প্রথম স্টেথোস্কোপ। এখন অবশ্য ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। হৃদয়ের স্পন্দনের শব্দকে এই স্টেথোস্কোপ কম্পিউটারে যুক্ত হয়ে রেখাচিত্রে রূপান্তরিত করে দেয়। এটা এমন কিছু বিস্ময়ের নয়। আজকাল কানে-গোঁজা যন্ত্রের গানের গুঁতোয় আর নানা ধরনের শব্দতাণ্ডবে জোয়ান মানুষদেরও শোনার ক্ষমতা তলানিতে। ডাক্তারদের মাঝেও এমন মানুষ মিলবে। কানে খাটো বুড়ো ডাক্তাররা কানের উপরে ভরসা হারালে কম্পিউটারে শব্দের রেখাচিত্র দেখে হৃদয়ের শব্দের রকমফের আন্দাজ করার চেষ্টা করতে পারেন এই ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ দিয়ে। শব্দের মাত্রা বাড়িয়েও শোনা যেতে পারে। এটা যান্ত্রিক বুদ্ধির এক চরম ব্যবহার।

আমার এক সহপাঠীর দুই কানের পর্দায় ছিদ্র ছিল। স্টেথোস্কোপ দিয়ে হৃদয়ের শব্দ খুব একটা চিনতে পারত না। কিন্তু তার বুদ্ধি তুখোড়। ডাক্তারদের পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগের যে সব রুগী থাকত ভাবী ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ যাচাইয়ের জন্য তাঁদের হৃদয়ের শব্দ অস্বাভাবিক হবেই এটা ছিল তাঁর অনুমান। স্বাভাবিক হৃদয়ের শব্দওয়ালা রুগী কেনইবা পরীক্ষায় থাকবেন? স্টেথোস্কোপ দিয়ে সে অস্বাভাবিক শব্দের ধরনধারণ শুনতে ও বুঝলে না পারলেও কেবল তুখোড় বুদ্ধির জোরে সে সম্ভাব্য রোগ নির্ণয় করে ফেলত। কারণ সে জানত, মানে তাকে বুদ্ধি খরচ করে জানতে হয়েছে— এমবিবিএস ডাক্তারি পাঠ্যক্রমের অন্তিম পরীক্ষায় তার ভাগে-পড়া রুগীদের মধ্যে যাঁদের হৃদয়ের অস্বাভাবিক শব্দের তীব্রতা বেশি, সেগুলিই সে কেবল শুনতে পারবে, সেই রোগের নাম বইপত্রেই লেখা থাকে (যেমন Mitral Valve Regurgitation)। আর যেগুলোতে সে কোনো অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পারবে না সেগুলো অন্য ধরনের রোগ (যেমন Mitral Stenosis)।

হৃদ্‌স্পন্দনের লাব-ডুব বা বাংলায় ধুকপুক শব্দ— কিছু কিছু

হৃদরোগে সেই স্বাভাবিক শব্দদ্বয়ের ফাঁকফোকরে বেশ কয়েক ধরনের অস্বাভাবিক শব্দের সৃষ্টি হয়। যেটা শুনে ও বিশ্লেষণ করে কাজের উপযোগী রোগনির্ণয় সম্ভব। ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ এই শব্দগুলিকে রেখাচিত্রে রূপান্তরিত করে আধুনিক ডাক্তারদের কানের উপরের চাপ কমিয়ে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, যন্ত্রের এই আগ্রাসনে একই সঙ্গে আমরা ভুলেও যাচ্ছি হৃদয়ের শব্দ কানে শুনে তাকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা।

'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' বাগধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন, কুলো ভেঙে গেলেও তাকে ফেলে দিতে নেই। কখনও সেই ভাঙা কুলোই কাজে লেগে যেতে পারে। আমাদের অগোচরে আমাদের নাড়ি-টেপা ডাক্তারির ভাঙা কুলো আমরা ফেলে দিচ্ছি। আলিঙ্গন করে নিচ্ছি ডিজিটাল ডাক্তারিকে।

মেঘ এখন ডাক্তার:

মানুষ ডাক্তারদের পসার চৌপাট করে দিতে মেঘ-ডাক্তার প্রায় এসেই গেছে। নবতম স্টেথোস্কোপ নবীন ডাক্তারদের মেধা ও বুদ্ধির উপরে ভরসা না করার আরও একটা উপায়ের সন্ধান দিচ্ছে। এই স্টেথোস্কোপ ডাক্তারের বুদ্ধি আর প্রশিক্ষণ আর তাঁর ক্লিনিকের কম্পিউটারের রেখাচিত্রের উপরে নির্ভর করে না। এই স্টেথোস্কোপের আধুনিক সংস্করণের সরাসরি মেঘের উপরে ভরসা করতে প্রলুব্ধ করছে নব্য ডাক্তার ও তাঁর চেয়ে বেশি করে কম্পিউটারপ্রেমী রুগীদের কাছে। এইখানে ডাক্তারের শোনার ক্ষমতা আর তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা (limitation) থাকছে না, ডাক্তারের শোনার ক্ষমতার দামও থাকছে না।

কথায় বলে চেনা বামুনের পৈতে লাগে না। আধুনিক চিকিৎসা-প্রযুক্তি বলতে চাইছে, অচেনা আধুনিক ডাক্তারদের গলায় স্টেথোস্কোপও লাগে না। এইভাবে বারোয়ারি পুজোয় অপাঙ্‌ক্তেয় বামুনের মতো আগামী দিনের জটিল রোগের চিকিৎসায় ডাক্তারদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে কি?

মেঘ-ডাক্তারের স্টেথোস্কোপের কথা শোনা গেল ২৮শে অক্টোবরের টাইমস অভ ইন্ডিয়া পত্রিকায়। মেঘ-ডাক্তার বলতে 'ক্লাউড কম্পিউটিং'-এর কথা বলছি। এর মানে, এক বিশাল ব্যবসায়িক বন্দোবস্ত। রুগীদের কাছে ডাক্তারের কানের চেয়ে বুঝিবা বেশি ভরসার এক উপায়। স্টেথোস্কোপের তথ্য সরাসরি আন্তর্জালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারের চুরি হয়ে গিয়ে, রোগভোগ নির্ণয় করে তাঁর চিকিৎসার একটা নিদান দিয়ে দিচ্ছে নিমেষে। সেটার ব্যাখ্যা রুগী জানেন না, তাঁর চিকিৎসক জানেন কিনা সন্দেহ! কারণ তিনি আধুনিক চিকিৎসক, হৃদয়ের আস্বাভাবিক শব্দের সঙ্গে তেমনটা পরিচিত নন। এই যেমন, এখম আর টাইপরাইটার, টর্চ, রেডিও, অ্যালার্ম ঘড়ি আর ক্যালকুলেটর আমাদের কাজে লাগে না— সস্তার স্মার্ট ফোন এই সব যন্ত্রের কাজ একাই করে দেয়। পাতি স্টেথোস্কোপের নবতম মেঘ-অবতার কি ডাক্তারদের সাহায্য করবে, না তাঁদের অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে?

গত মাসের ঘটনা। একটু অন্য ধরনের চিত্র। আমরা যতই যন্ত্রের জয়গান গাই না কেন, এটাই ঘোর বাস্তব। আমাদের শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে সকাল আটটায় এক বছর চল্লিশের তরতাজা মানুষের বুকে ব্যথা হল। পাড়ার ডাক্তার একই সঙ্গে হার্টের ওষুধ 'সরবিট্রেট' আর অম্বলের ওষুধ খাওয়ার নিদান দিলেন। যন্ত্র ছিল না বলে, আর নাড়ি-টেপা ডাক্তারি জানা ছিল না বলে বোঝা গেল না, তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। বুকের ব্যথা দুপুর নাগাদ তীব্র হল। পাড়ার ওষুধের দোকানে হার্টের ডাক্তার আসেন বিকেলে। বিকেলে হার্টের পরীক্ষা হল। সরকারি হাসপাতালে ছুটলেন রুগী। সেখানে বেড বাড়ন্ত। অগত্যা রাত আটটায় তাঁর ঠাঁই হল স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে। ততক্ষণে হার্ট অ্যাটাকের অব্যবহিত পরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি চিকিৎসার (revascularization therapy— primary angioplasty অথবা fribrinolytic theray) সময় অতিক্রান্ত। দু মাসের মধ্যে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের কর্মক্ষমতা পাকাপাকিভাবে তলানিতে। হৃদ্‌যন্ত্রের পাম্প করার ক্ষমতার নিম্নসীমা ৫৫ শতাংশ হলে এঁর পাম্পের ক্ষমতা (ejection fraction) ৩৫%। ফলে আয়ুক্ষয় তো হলই, বাকি জীবনটা ওঁকে বাঁচতে হবে বিস্তর অর্থব্যয়ে। হার্ট এটাকের পরে এমনিতেই ওষুধের পিছনে খরচ বেশ বেশি। তার উপরে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য আরও বেশি ওষুধের দরকার। আর সেটা লাগবে জীবনভর। নাড়ি-টেপা ডাক্তারি স্বমহিমায় বিরাজ করলে, তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সেটা সঠিক সময়ে অনুমান করা যেত, দুর্ঘটনার গুরুত্ব বোঝা যেত, সময়সীমার মধ্যে revascularization therapy প্রয়োগ করাও হত। উন্নত দেশে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরাই রক্তের ডেলা গলানোর চিকিৎসা বা Fribrinolytic theray চালু করে দেন। তেমনটা করা গেলে তাঁর হার্টের পেশির কিছুটা অংশর পাকাপাকিভাবে মৃত্যু ঠেকানো যেত। উনি অন্তত আরও ১০ বছর বেশি বাঁচতেও পারতেন।

এখন পাড়ায় পাড়ায় সকালে হারমোনিয়ামের প্যাঁ পোঁ রেওয়াজ শোনা যায় না। গান শেখার সময়ে কানকে শেখাতে হয়, শিক্ষার্থীর গলাসাধার সময়ে সৃষ্ট শব্দ সঠিক তরঙ্গের হচ্ছে কিনা। এক্ষেত্রে কানই সহায়। হারমোনিয়ামের প্যাঁ পোঁ শব্দের তরঙ্গের সঙ্গে নিজের গলার শব্দের তরঙ্গের যুগলবন্দী হল কিনা সেটা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ। স্টেথোস্কোপের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই কথাটি সর্বাগ্রে প্রযোজ্য।

ডাক্তারি প্রশিক্ষণে কানের প্রশিক্ষণের জন্য অনেকটা সময় রুগীর সঙ্গে কাটাতে হয়। হৃদয়ের স্বাভাবিক লাব-ডুব শব্দের আগে-পিছে বিভিন্ন তরঙ্গের শব্দ তৈরি হয় হৃদয়ের কিছু

কিছু রোগে। সেটা শুনে আর নিশ্চিত করে তার স্বরূপ বুঝে নিয়ে রোগনির্ণয়ের দীর্ঘমেয়াদি একটা তালিম আর রেওয়াজ দরকার। সেটা কে বোঝাবে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ডাক্তারি প্রশিক্ষণের গুরুদেবদের!

এখন স্টেথোস্কোপ ব্যবহার না করেও বুকের ও পেটের রোগনির্ণয় সম্ভব। ছাত্রাবস্থায় আমরা পেটের উপরেও স্টেথোস্কোপ বসিয়ে অন্ত্রের মধ্যের শব্দ 'PERISTALTIC SOUND' শুনতাম। অনুমান করে নিতে পারতাম, পেটের অস্ত্রোপচারের পরে তাঁর অন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে কিনা। স্যালাইন বন্ধ করে মুখে-খাওয়া শুরু করা যাবে কিনা। এখন মেডিকেল কলেজে সেটা শেখানো হয় বলে মনে হয় না।

নতুন প্রযুক্তি আসে। কিছু প্রযুক্তি টিকে যায়, মানুষের কাজে লাগে। কিছু হারিয়ে যায়। কিছু প্রযুক্তি সামগ্রিক মানুষের উপরে প্রয়োগযোগ্য নয় বলে কেবল জ্ঞান বাড়ায়, কাজে লাগানো যায় না। যেমন, ভেক্ট্রোকার্ডিও (VECTROCARDIOGRAPHY)। এটি ইসিজি পরীক্ষার এক জটিল ও তথ্যবহুল অবতার। ইকোকার্ডিওগ্রাফি আবিষ্কারের পরে এটি ব্রাত্য হয়ে গেছে।

আবার কিছু প্রযুক্তির দরকচা মারা দেশি অকাজের সংস্করণ ব্যবসায়িক কারণে ফুলে ফেঁপে ওঠে। সাধারণ মানুষ তার কথা জানতেও পারে না। রাষ্ট্র বোধহয় কখনও কখনও সেটার আভাস পায়, সাধারণ মানুষের সচেতনার অভাবের সুযোগে রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে নীরব থাকে। নীরব রাষ্ট্র সচেতনে বা অবচেতনে চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের মানুষ ঠকানোর সুযোগ করে দেয়। অ্যালার্জি টেস্ট তেমনই একটি প্রযুক্তি। আপনার চামড়ায় অ্যালার্জি বা হাঁপানি হলে বা সুস্থ থাকলেও যদি এই পরীক্ষা করে ফেলেন, আপনার ৩৬ রকমের পদার্থে অ্যালার্জি বেরিয়ে যেতে পারে। সন্দেহ করি না ঐ পরীক্ষার ফলের সততায়, কিন্তু জানি, এটা জেনে আপনার কোনো লাভ নেই। ঐ পদার্থগুলো যেমন আপনি এড়াতেও পারবেন না, আবার এর প্রতিষেধক হিসাবে আপনার জন্য 'Tailor Made' টিকায় আপনার উপকারও হবে না। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় এর অনুমোদন নেই।

মাস্টার হেল্‌থ চেক-আপ শুধু একটা অকাজের প্যাকেজই নয়, রীতিমতো ক্ষতিকর। কত রকম নতুন নতুন প্যাকেজ নিয়ে চিকিৎসা সওদাগররা আপনাকে প্রলুব্ধ করছেন— কিডনি প্যাকেজ, থাইরোইয়েড প্যানেল, লিপিড প্রোফাইল, ক্যান্সার প্যাকেজ...। আপনার সারা বছরের স্বাস্থ্য অবহেলার সমাধান হিসাবে আপনার 'knee Jirk response' বা তাৎক্ষণিক আবেগের প্রতিক্রিয়ার খোঁজখবর বেশ ভালো করে জানেন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা। একগাদা পরীক্ষা কিনলেন বলে কিছুটা সস্তায়ও হয়ে যায় এগুলো। আপনি দামি কাগজে একগাদা পরীক্ষার ফল পেলেন, সবকিছু হয়ত বুঝলেন না— অস্বাভাবিক রিপোর্টের বোঝা নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে চেম্বারে আপনার চরকি কাটা শুরু হল। ডাক্তার, যিনিও আপনাকে আগে পরীক্ষা করেননি যে কোন পরীক্ষা আপনার প্রয়োজন, অস্বাভাবিক রিপোর্ট দেখেই নিদান দিলেন, আরও খতিয়ে দেখার 'স্পেশাল' পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কারণ, অস্বাভাবিক পরীক্ষা অবজ্ঞা করার বোঝা তিনিই বা কেন নেবেন! এই চক্রব্যূহ থেকে আপনার ইহকালে মুক্তি মেলে না। একটা আপ্তবাক্য আমরা চিকিৎসকেরাও ভুলে যাই, চোখ বুজে এইসব চিকিৎসা সংক্রান্ত প্যাকেজের পরীক্ষায় রুগীর কোনো লাভ নেই। চিকিৎককে যে ভূমিকাটা পালন করতে হয় সেটা অনেকটা গোয়েন্দার মতো, পুলিসের মতো। কোনো গড়বড় হলে সেই জায়গার সবাইকে গারদে পুরে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে দুষ্কৃতীকে ধরা যায় না। আগে যুক্তি মেনে সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের একটা তালিকা বানাতে হয়। আসলে পেশাদারি বুদ্ধি বিনা প্রযুক্তি, অকাজের।

আপনি যদি আপনার পছন্দের খাবার খেতে চান, তবে রেস্তোরাঁয় 'অ্যালাকাট' খাবারের অর্ডার করবেন, বুফের কাউন্টারে যাবেন না। 'আলাকাট' বা আপনার সঠিক পছন্দের খাবার— কম ঝাল বা বেশি ঝাল আপনার এইসব পছন্দ মেনে আপনাকে খাবার পরিবেশন করবে রেস্তোরাঁ। আপনি তাজা খাবার পাবেন। বুফে কাউন্টারে আপনাকে কিছুটা আপস করে নিতেই হয়, যদিও সেখানে অনেক ধরনের খাবার সাজানো থাকে। মাস্টার হেল্‌থ চেক আপ হল বুফের কাউন্টার, আপনার চিকিৎসক আপনার সমস্যা শুনে, আপনার হাল-হকিকত বুঝে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় যে পরীক্ষার তালিকা দেবেন, সে হল ঐ 'অ্যালাকাট'— আপনার জন্য উপযোগী উপায়। সংখ্যায় কম বলে, এই পরীক্ষাগুলো একটু বেশি যত্নও পায় পরীক্ষাগারে। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বটে।

এগুলো তবু মূলত অপেক্ষাকৃত লঘু মাপের প্রযুক্তির অপব্যবহার। মূলত বললাম সচেতনভাবেই 'কেবল' বললাম না। এগুলো মূলত পকেট কাটে। এর চেয়ে গুরুতর হল— হার্ট অ্যাটাকের দু ঘণ্টার মধ্যে নয়, পরে হাসপাতালের সুবিধাজনক সময়ে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা। আর সেই অজুহাতে হৃৎপেশির ধমনীর মধ্যে রক্তের ডেলা গলানোর ওষুধ (thrombolysis therapy- Streptokinase ইত্যাদি ওষুধ) প্রয়োগ না করা। হার্ট অ্যাটাকের ঠিক পরে যত শীঘ্র সম্ভব দুটো চিকিৎসার একটা প্রয়োগ করতে হয়— প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (২ ঘণ্টার মধ্যে) অথবা সেটার সুযোগ না থাকলে থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ (Fibrinolytic বা thrombolytic therapy, ৬ ঘণ্টার মধ্যে)। এর একটাও না করা গেলে তার দীর্ঘমেয়াদি কুফল ভোগ করতে হয়। মেনে নিতে হয় হার্ট ফেলিওর আর আয়ুক্ষয়। রুগীকে তাঁর

অজান্তে মেনে নিতে হয় আর যে ক'দিন বেঁচে থাকতে হবে সেই ক'দিনের বিশাল চিকিৎসার খরচ, কমে যায় তাঁর কর্মক্ষমতা।

'নাড়ি-টেপা ডাক্তারি'' একটা রূপক। এই কথাটা দিয়ে আমরা ডাক্তারের 'ক্লিনিকাল স্কিল' অর্থাৎ রোগের কষ্টের বিবরণ বিশ্লেষণ করে আর শারীরিক পরীক্ষা করে তার প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার কথা বলে থাকি। ধরুন, আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে, হাল্কা জ্বরও হয়েছে। নাড়ি-টেপা ডাক্তার আপনার কষ্টের বিবরণ শুনে, নাড়ি টিপে, স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুকের শব্দ শুনে, বুকে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে কী সব শব্দ শুনলেন। আপনাকে ফিসফিস করে 'তিন তিন তিন' বা 'নাইন্টিনাইন' বলতে বললেন। জানি না, আজকাল এইসব পরীক্ষা কেউ করেন কিনা, এও জানি না কোনো রুগীকে বুকের পরীক্ষার সময় ডাক্তার তাঁকে আজকাল 'তিন তিন তিন' বা 'নাইন্টিনাইন' বলতে বলেন কিনা। আপনারা, যাঁরা আমার এই কথা শুনে ডাক্তারের দক্ষিণা তিন টাকা না নিরানব্বই টাকা ইত্যাদি নিয়ে ধন্দে আছেন, সেই অবসরে নাড়ি-টেপা ডাক্তার আপনার বলা 'তিন তিন তিন' শুনলেন আপনার বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে। আর আপনার বুকের রোগনির্ণয় করে ফেললেন। বললেন, আপনার ফুসফুসে হয় বড় আকারের নিউমোনিয়া অথবা টিউমার আছে (consolidation)। এসব এখন লুপ্তপ্রায় ডাক্তারিবিদ্যা। এই শারীরিক পরীক্ষাটির নাম হুইসপারিং পেক্টোরিলোকুই (Whispering Pectoriloque)। নাড়ি-টেপা ডাক্তারিতে বিভিন্নভাবে আনুমানিক রোগের অস্তিত্ব বোঝার উপায় আছে। কেবল একটা লক্ষণ মিলিয়ে সেটা করা হয় না বলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ ডাক্তার যে রোগটা ভাবলেন, সেটার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য আপনার রোগলক্ষণ বিশ্লেষণ করে ও শারীরিক পরীক্ষা করে একাধিক উপায়ে আপনার রোগের হাল-হকিকত বোঝার চেষ্টা করেন। ঠিক করে ফেলেন, তাঁর চিকিৎসার নিদান। এমনটা করে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা শুরু করা যায়। এইভাবে নাড়ি-টেপা ডাক্তার বিস্তর মাথা ঘামিয়ে আপনাকে হয়ত প্যারাসিটামলের বড়ি দিলেন, কখনও বা সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক। আবার কখনও হয়ত কিছুই দিলেন না। তিনি এমন ক্ষেত্রে ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হবেন। বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (blood tests, CXR, CT chest) প্রযুক্তিপ্রিয় ডাক্তার এই সম্ভাবনা কতটা বাড়াতে পারবেন তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে যান্ত্রিক পরীক্ষানির্ভর চিকিৎসা শুরু করতে কিছুটা যে দেরি হবে সেটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

চিকিৎসা পরিষেবায় ১০০ শতাংশ নিশ্চয়তা বলে কিছু হয় না। ডাক্তারদের সবসময়েই একটা সম্ভাবনার অঙ্ক কষে তার বিদ্যা প্রয়োগ করতে হয়। একটা ঝুঁকি আছে বলেই অপারেশনের আগে রুগী/ তাঁর আত্মীয়-পরিজনকে ঝুঁকির কথা জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনুমতিপত্রে সইসাবুদ করে নিতে হয়। আজকাল তো হাসপাতালে জ্বরজ্বালা নিয়ে ভর্তির সময়েই একগাদা সাদা কাগজে আর ফাঁকা অনুমতিপত্রে সই করে দিতে হয়।

রুগী যখন সোজাসাপটা প্রশ্ন করেন, ডাক্তারবাবু আমার কী রোগ হয়েছে বা আমার বাবা মারা গেলেন কেন? তখন মিথ্যে না বলতে চাওয়া প্রযুক্তিপ্রিয় ডাক্তারও বলতে বাধ্য হন 'এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি জানি না।' এই না জানায় সব সময় ডাক্তারের অক্ষমতা প্রকাশ পায় না, কারণ ডাক্তার একজন প্রযুক্তিবিদ মাত্র। এই অক্ষমতা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অক্ষমতা। উত্তর না জানা প্রশ্ন আছে বলেই বৈজ্ঞানিকদের অন্বেষণ জারি থাকে।

আপনার পেটের হয়ত উপরের দিকে ব্যথা হয়েছে, সম্ভাবনা খুব অল্প হলেও সেটা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ বা প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিসও হতে পারে। অধিকতর সম্ভাবনা হল পাকস্থলীর প্রদাহ (Gastritis) বা অম্বলের রোগ। নাড়ি-টেপা ডাক্তার পেট টিপে, বিস্তর মাথা ঘামিয়ে নিদান দেবেন অম্বলের ওষুধ (Omeprazole, Pantoprazole, বা Rabiprazole)। ডাক্তার খেয়াল রাখেন, তাতে রোগোপশম না হলে পিত্তথলিতে পাথর বা পাকস্থলীতে ক্যান্সার হল কিনা। সেটা দু দিন পরেই যথোপযুক্ত পরীক্ষা করেন। আমাদের মাস্টারমশাইরা পেটে হাত দিয়েই বলতে পারতেন রুগীকে এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে, এঁর পাকস্থলী ফুটো হয়ে গেছে, এঁর পেরিটোনাইটিস হয়েছে। রোগনির্ণয়ে রুগীর কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা লাগত না।

প্রযুক্তিপ্রিয় ডাক্তার প্রথমেই হুকুম করবেন— Liver function test, USG, Endoscopy। এইসব পরীক্ষায় রোগের হদিশ না পেলে পরীক্ষার অভাব নেই। এটা প্রযুক্তিপ্রিয় ডাক্তারদের কাছে ভরসার— তবে রুগীর কাছে নয়। সুতরাং হতে থাকে Serum Amylase, Lipase, ERCP যার গালভরা নাম Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography অথবা MRCP Magnetic Resonance Cholangio-Pancreatography। খুঁতখুঁতে ডাক্তার হলে পেটের CT স্ক্যানও করতে বলবেন। এই সব সমাধা হলে তখনও কোনো রোগের হদিশ না পেলে নিদান দেবেন ঐ অম্বলের ওষুধ। তবে বেশি দামি ও অল্প পরিচিত নামে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে, সেটার বিচার-বিবেচনা কে বা কারা করবেন? কে বা কারাই বা করবেন তার নিয়ন্ত্রণ? কে বা কারা ঠিক করে দেবেন তার নির্দেশিকা?

যা বলছিলাম, ডাক্তারি শাস্ত্রটা এখনও বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে রোগ সম্ভাবনা অধিকাংশ সময়েই ১০০% নিশ্চয়তা দিতে পারে না। অভিজ্ঞতা-নির্ভর ব্যবহারিক অনুমানের ও তার ঝুঁকির হিসেব নিয়েই ডাক্তারিবিদ্যাকে চলতে হবে আরও অনেক দিন। অনেক ক্ষেত্রে রোগনির্ণয় ও তার আধুনিক চিকিৎসা কেবল চিকিৎসকের অনুমান নির্ভর: যন্ত্র সেখানে আলো

ফেলতে পারে না। যেমন hyperventilation syndrome। এটা আবার কোন রোগ? সিন্ড্রোম মানেই একটা গোলমেলে ব্যাপার। সিন্ড্রোম মানে মোটেই একটা সুনির্দিষ্ট রোগের নাম নয়। একটা অস্পষ্টতার মুখোশে সহধর্মী কয়েকটি রোগলক্ষণের সমষ্টি মাত্র। এই সঠিক না-জানা কারণেই রুগীর রোগনির্ণয়ে আপস করে নিতে হয়। সেই মতোই নিদান চালু করতে হয়।

একবার এক কিশোরীকে নিয়ে তাঁর বাবা আর মা এলেন। মেয়েটির সামনেই স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা। হঠাৎ মেয়েটির হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টের একটা রোগ শুরু হল। আগে কখনও এই রোগের আভাস ছিল না। মনে করা যাক মেয়েটির নাম তৃষা। আতঙ্কিত বাবা-মা তৃষাকে নিয়ে ক্লিনিকে এলেন। তৃষার বাবা বললেন, 'অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পড় তৃষার মা বেশ চিন্তিতভাবেই বলল, এবার ডাক্তার না দেখালেই নয়। মেয়ের শ্বাসকষ্ট আজ বেশ বাড়াবাড়ি রকমের হচ্ছে। স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। সামনের সপ্তাহেই ওর পরীক্ষা। কী যে হবে! আরও জানা গেল— এগারো ক্লাসে ভর্তি হওয়ার সময় তৃষার বাবা ওকে স্কুল পাল্টে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছেন। এই স্কুলের নামডাক আছে। তৃষার ওজর-আপত্তিকে পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। এই সব ব্যাপারে তৃষার মায়ের মতামতের মূল্য আছে বলে তৃষা মনে করে না।

মেয়ের ঘরে উঁকি মেরে মেয়ের বাবা দেখল তৃষা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তেমন কোনো কষ্ট হচ্ছে বলে বোঝাই যায় না। তৃষার বাবা ভাবলেন, এ আবার কী রোগ রে বাবা! তৃষার ঠাকুরদার শ্বাসকষ্টের ব্যামো ছিল। বিড়ি-খাওয়া রোগ। রোজ সন্ধে হলেই কাশির দমক বাড়ত। ইনহেলার না নিলে শ্বাসকষ্ট কমত না। সে তো এমন শুয়ে থাকতে পারত না। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আর ছিটেফোঁটা যুক্তি দিয়ে তৃষার বাবা মেয়ের শ্বাসকষ্টের কারণ বোঝার চেষ্টা করলেন। এর মধ্যে তৃষা বড় বড় তিন-চারবার লম্বা লম্বা শ্বাস নিল। তারপর মুখ কালো করে চুপচাপ বসে রইল। তাকে দেখে রুগ্‌ণ বলে বোঝাই যায় না।

আমাদের ব্যথা, বেদনা, বা ভাষায় প্রকাশ করতে না পারা অন্যান্য কষ্টের কোনো ঘটনা হলে আমাদের সামাজিক ধারণা আর গুজবের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশী, খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রাস্তার বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং ইত্যাদি থেকে পাওয়া জ্ঞান আমাদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরিক কষ্টের মধ্যে শ্বাসকষ্ট সবচেয়ে আমাদের হতবুদ্ধি করে দেয়। প্রথমেই মনে পড়ে হার্টের রোগ আর হাঁপানি রোগের কথা। এটা ভাবার সঙ্গত কারণও আছে। ঐ রোগগুলোকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই।

তৃষার বাবা-মাও এই রকমের দুর্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার আগে উৎকণ্ঠায় ঘায়েল ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে এই সমস্যায় ভোগেন। কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই রোগের হদিশ মেলে না। বড় জোর হাঁপানি বা হৃদ্‌রোগ নেই, এটা পরীক্ষা করে নেওয়া হয় সন্দেহ থাকলে। তারপর চলে অনুমান-নির্ভর, ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রমাণ ছাড়াই চিকিৎসা। এই রকম সমস্যায় নাড়ি-টেপা ডাক্তার দেবেন ভরসা, কিছুটা কাউন্সেলিং করবেন, আর অল্পবিস্তর উৎকণ্ঠা কাটানোর বড়ি বা anxiolytics-এর নিদান দেবেন। প্রযুক্তিপ্রিয় ডাক্তার চেস্ট এক্স রে, PFT, ECG, Echocardiography ইত্যাদি হরেক রকমের পরীক্ষা করে কিছু শারীরিক রোগের সন্ধান না পেয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবেন। চিকিৎসা একই, তবে বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে।

আমরা নাড়ি-টেপা ডাক্তারিবিদ্যা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি:

নতুন প্রযুক্তিতে আসক্ত ডাক্তার মেডিকেল কলেজের প্রশিক্ষণ ভুলে যান বা বলা ভাল, আজকাল মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা তেমন মাস্টারমশাই পান না, যিনি কিঞ্চিৎ প্রাচীন। অথবা এমনও হতে পারে, যে শিক্ষক পান, তিনি এই জ্ঞান নিজেই শেখেননি বা ভুলে মেরে দিয়েছেন। নাড়ি-টেপা ডাক্তার যন্ত্রপাতি ছাড়াই বেশ কিছু রোগ চিনে নিতে পারতেন— যেমন, 'পাল্‌স ডেফিসিট' চিনে ইসিজি না করেই অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন রোগনির্ণয় করতে পারতেন। আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের আগে নাড়ি-টেপা ডাক্তাররা গলার শিরার স্ফীত ভাবের ধরন ও স্পন্দন (Jugular Venous Pressure) দেখে ইকোকার্ডিওগ্রাম ছাড়া মারণাত্মক কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেড (Cardiac tamponade) রোগ আর হার্টের সাইজ (Apex beat) মেপে ও তৃতীয় হার্টের (3rd Heart Sound) শব্দ শুনে ইকোকার্ডিওগ্রাম ছাড়া হার্ট ফেলিওর রোগ চিনে নিতে পারতেন। রোগনির্ণয়ে হারিয়ে যেতে বসা 'Clinical Medicine' যে সব ভুল করত, সেসব ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাড়বাড়ন্তে বোধহয় শোধরানো যায়নি। মৃগীরোগে প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম (EEG) স্বাভাবিক বেরোয়। পরীক্ষার কোনো ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রমাণ ছাড়াই চালু করতে হয় এই রোগের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা।

কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের কারণ নির্ণয় প্রথমেই নিশ্চিত করে নিতে হয়:

শ্বাসকষ্টের কারণ হিসাবে হাঁপানি না হার্ট ফেলিওরের রোগ, নাকি একসাথে দুটোই? এটার কারণ নির্ণয় প্রথমেই দরকার, কেননা এই দুই কারণের রোগে চিকিৎসা একদম আলাদা। এই কারণ নির্ণয়ে এখন বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায় আছে। বুকের এক্স রে, ইসিজি, ল্যাং ফাংশন টেস্ট (PFT), ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এনটি-প্রোবিএনপি (NT-ProBNP) রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও অনেক সময় আমরা কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না। ল্যাং ফাংশন টেস্ট বলছে, হাঁপানি আবার NT-ProBNP রক্তপরীক্ষা বলছে

হার্ট ফেলিওর। ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে ভালো ছবি না পাওয়ায় জন্য রিপোর্ট এল— Poor Echo Window–ইজেক্সন ফ্রাক্সন~ 55%। অর্থাৎ নির্ণায়ক ইকোকার্ডিওগ্রাফি রিপোর্ট স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের সীমারেখায়। ফলে চলতে থাকে দুটো রোগেরই অল্পবিস্তর দাওয়াই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটার অনুমোদন নেই। প্রাচীন ডাক্তার কেবল নাড়ি টিপেই এই রোগ দুটো আলাদা করে চিনে নিতে পারতেন।

এখন চটজলদি ও সস্তা রোগনির্ণয় হয় না, যেটা নাড়ি–টেপা ডাক্তারি জানা আমাদের মাস্টারমশাইরা করতে পারতেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় (১৯৭৮–৮২) মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগে একটা ইসিজি পরীক্ষার যন্ত্র ছিল। আর মাঝে মধ্যে সেটা কাজও করত। বুকের এক্স–রে করার জন্য তারিখ নিতে হত। যেটা বহির্বিভাগের রুগীদের ক্ষেত্রে ২ সপ্তাহ আর হাসপাতালে ভর্তি–থাকা রোগীর ক্ষেত্রে অন্তর পরের দিন, অফিস টাইমে। ব্যস, হাতিয়ার এখানেই শেষ। তাতে হাঁপানি আর হার্ট ফেলিওর রুগীর ভুল চিকিৎসা হত এমন স্মৃতি নেই। হারিয়ে যেতে–বসা ক্লিনিকাল স্কিলের অব্যবহারে আমদের সেই ক্ষমতা নেই। রোগের প্রমাণ দর্শানো ও তার সংরক্ষণের আইনি রক্তচক্ষুও ডাক্তারি পেশার ক্লিনিকাল স্কিলের অপমৃত্যুর একটা কারণ বটে।

এই একবিংশ শতাব্দীর একটা মেডিকেল কলেজে আমি কিঞ্চিৎ পরিষেবা দিই। আমাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করতে হয়। সেখানে দেখেছি, বিস্তর হার্ট ফেলিওরের রুগীর হাঁপানির চিকিৎসা চলছে, কেউ কেউ হাসপাতালে এক সপ্তাহ কাটিয়ে বাড়িতে চলে গেছেন। হার্ট ফেলিওরের রুগী কষে হাঁপানির ইনহেলার, ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করে চলেছেন। ঐ হাসপাতালে এমডি পাঠ্যক্রম চালু থাকলেও ভরসাযোগ্য ভাবে ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করার প্রযুক্তিবিদ নেই। হয়ত সেখানের ডাক্তারদের জানাও নেই নাড়ি–টেপা ডাক্তারিবিদ্যা।

উমা

চলেছে বইপত্রের বিকিকিনি

অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

সঙ্গীতে অনুষ্ঠান শুরু করছেন মেধা জানা

প্রারম্ভিক কথায় প্রকাশক বরুণ ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করছেন শ্যামল ভদ্র

নিরীশ্বর বোধোদয়

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

‘অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো প্রকার ধর্মবিশ্বাস ছিল না।’ এইভাবেই চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন তাঁর বিদ্যাসাগর-জীবনীর ‘ধর্মমতে বিদ্যাসাগর’ অধ্যায়টি (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৫)। চণ্ডীচরণ তা মনে করতেন না, যদিও তিনি অস্বীকার করেন নি যে তাঁর (বিদ্যাসাগরের) ধর্মবিশ্বাস ‘সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোনো এক পদ্ধতির অধীন ছিল না’, আর ‘সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই’ (ঐ)।

নিজের বক্তব্যর সমর্থনে চণ্ডীচরণ একটি গল্প লিখেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ম। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একদিন দেখা করে তিনি জানালেন, মশায়, অনেকে আমার কাছে বলেন, বিদ্যাসাগর মশায় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্য-পুস্তক রচনা করলেন, বালকদের জানবার সকল কথাই তাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা নেই কেন?

উত্তরে বিদ্যাসাগর নাকি একটু হেসে বলেছিলেন, যাঁরা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁদের বোলো, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হবে তাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে। (ঐ পৃ. ৪৬৬)।

চণ্ডীচরণ মন্তব্য করেছেন: ‘ইহার পরবর্তী সংস্করণে [হুবহু] হইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি পাঠ বোধোদয়ে সন্নিবিষ্ট হইল। নিজ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে তাঁহার মতো শিক্ষার সুহৃদ বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বর-বোধক পাঠ সন্নিবিষ্ট করিতেন না। বোধোদয়ের মতই তাঁহার ধর্মমত’ (ঐ)।

এই গল্প একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লোকে পড়ে আসছেন, অনেকেই বিশ্বাসও করছেন। কিন্তু ঘটনা এই যে আগাগোড়াই এটি একটি গল্প; তথ্যর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বোধোদয়-এর প্রথম সংস্করণের (১৮৫০) প্রথম নিবেশ (এন্ট্রি) টির নাম ছিল : ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ’। দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৫২)ও শুরু হয়েছে এই দিয়ে। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তার কিছু গৌণ পাঠভেদ আছে। প্রথম সংস্করণ থেকে এই নিবেশটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন পরমেশ আচার্য (১৩৯১ ব. পৃ. ৪৮)। এখানে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পুরোটাই নিচে দেওয়া হলো (পরিশিষ্ট ক দ্র.)।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে যে-গল্পটি চণ্ডীচরণ ফেঁদেছেন, সেটি একেবারেই ভুল। বোধোদয়-এর প্রথম দুটি সংস্করণে অবশ্যই ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু এও ঘটনা যে তার পরের কোনো এক সংস্করণ থেকে — ঠিক কোন্ সংস্করণ তা বলা যাচ্ছে না, সম্ভবত পঞ্চম (১৮৫৬)— ঈশ্বর-এর কথা আর আসে নি।

সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে যে-গল্পটি চণ্ডীচরণ ফেঁদেছেন, সেটি একেবারেই ভুল। বোধোদয়-এর প্রথম দুটি সংস্করণে অবশ্যই ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু এও ঘটনা যে তার পরের কোনো এক সংস্করণ থেকে — ঠিক কোন্ সংস্করণ তা বলা যাচ্ছে না, সম্ভবত পঞ্চম (১৮৫৬)— ঈশ্বর-এর কথা আর আসে নি। আবার এও ঘটনা যে তারও পরের কোনো এক সংস্করণে ঈশ্বর প্রসঙ্গ ফিরে আসে। তবে এবার আর ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ’ নয়, প্রথম নিবেশটি দুটি আলাদা নিবেশে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথমে আসে ‘পদার্থ’, তারপরে ‘ঈশ্বর’। আর ‘অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম’ — এই বাক্যটি আর নেই (রচনাসমগ্র ২০১৬ পৃ. ১৭৭ দ্র.)।

এখনকার সব রচনাবলিতেই ঈশ্বর সম্পর্কে বোধোদয়-এর ১৮৮৯-এর ১০৫তম সংস্করণের নিবেশটি ছাপা হয়। এটিই বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকতে বোধোদয়-এর শেষ সংস্করণ। তার দুটি বাক্যই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল। সেইটুকুই ১০৫-তম সংস্করণে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই অংশটি দ রুডিমেন্টস অফ নলেজ-এর কিছু বাক্যর আক্ষরিক অনুবাদ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগ (২০১৬)-এর ‘গ্রন্থ

পরিচয়' অংশে সেটি ছাপা হয়েছে (পৃ. ৪১২)। মূল ইংরিজি বইটি নেট-এ পাওয়া যায়। পাঠকরা সেখানেও 'অফ গড অ্যান্ড দ ওয়ার্কস অফ ক্রিয়েশন' অংশটি দেখে নিতে পারেন। এখান থেকেই বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম নিবেশটি নিয়েছিলেন।

'পদার্থ'-র জায়গায় সেখানে আছে অবজেক্ট ।

ফলে চণ্ডীচরণ যে বলেছিলেন, 'বোধোদয়ের মতই তাঁহার ধর্মমত', সেটিও ভুল। বিদ্যাসাগর এখানে অনুবাদক মাত্র। এমনকী সেই বহু আলোচিত 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' বাক্যটিও গড ইজ আ স্পিরিট, অ্যান্ড ইজ ইনভিজিবল-এর তর্জমা, এর পেছনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নেই, রামমোহন রায় তো নেই-ই।

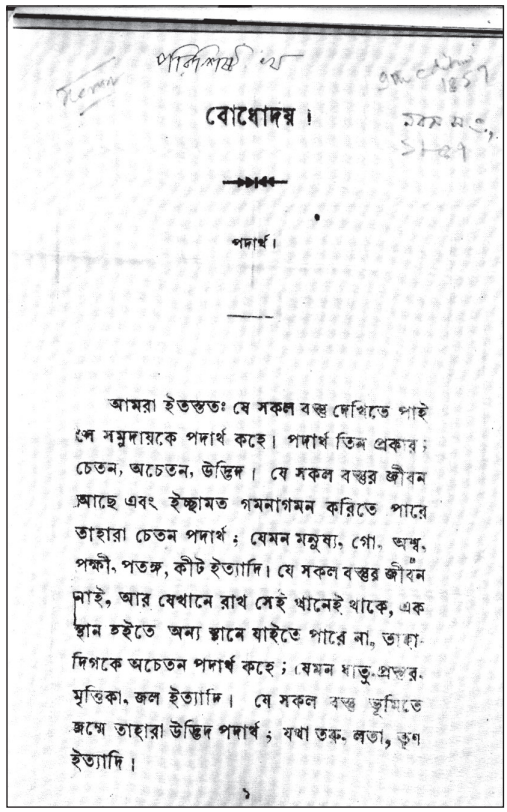

বোধোদয়।

পদার্থ।

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদায়কে পদার্থ কহে। পদার্থ তিন প্রকার; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে তাহারা চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য, গো, অশ্ব, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, আর যেখানে রাখ সেই খানেই থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি। যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে তাহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যথা তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

১

বিদ্যাসাগর কেন প্রথমে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ রাখলেন, পরে কেনই বা বাদ দিলেন, তারও পরে প্রথম নিবেশটির কয়েকটি বাক্য ফিরিয়ে আনলেন — তা বলার মতো তথ্য এই মুহূর্তে হাতে নেই। নবম সংস্করণে (১৮৫৭) আলাদা কোনো ভূমিকা ছিল না। পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন (১৮৫৬)-এ বিদ্যাসাগর বলেন, 'এইবার স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে এবং কোন কোন অংশ একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' মনে হয়, 'ঈশ্বর' সেইরকমই একটি পরিত্যক্ত অংশ। বিদ্যাসাগরকে যিনি 'চূড়ান্ত বস্তুবাদী' ও 'না-ধর্মী মতবাদী' (সেকিউলারিস্ট) বলে দুষেছিলেন সেই পাদরি জন মার্ডক (১৮১৯-১৯০৪) সেইরকমই একটি সংস্করণ দেখে অত চটে গিয়েছিলেন (ইন্দ্রমিত্র ১৯৯২ পৃ. ৭১৮-৭২১ দ্র.)।

মার্ডক ঠিক কোন্ সংস্করণ দেখেছিলেন তা বলা সম্ভব নয়। তবে তাঁর বিদ্যাসাগর-বিরোধী লেখাগুলি বেরিয়েছিল ১৮৬০-এর দশকে। তার মধ্যে বোধোদয়-এর পঞ্চম সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর আগের চারটি সংস্করণের কিছু কিছু রদবদল করেছেন। চোখে পড়ার মতো ব্যাপার হলো : নবম ও তার পরের কোনো সংকরণেই 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট' শব্দগুচ্ছ নেই (পরিশিষ্ট খ দ্র.)। শুধু তা-ই নয়, 'ত্বক্' শীর্ষক নিবেশটির শেষ অনুচ্ছেদ বাদ গেছে। সেই অনুচ্ছেদে বলা ছিল : 'ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে বাক্-শক্তি দিয়াছেন তদ্ভিন্ন আমাদিগের চিন্তাশক্তিও আছে। মনে যাহা চিন্তা করি জিহ্বা দ্বারা তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এই উভয়কে বাগিন্দ্রিয় কহে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়; কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোন কোন লোক এমন হতভাগ্য যে কথা কহিতে পারে না। উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা কহে' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০-৩১)।

কিন্তু নবম সংস্করণে দেখি 'ত্বক্' নিবেশটি শেষ হয়েছে এই বাক্যটি দিয়ে : 'কিন্তু যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছুমাত্র আলো নাই, সে স্থানে বিরাল [হুবহু] মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দেখিতে পায় না' (পৃ. ১৮)। এর পরের অনুচ্ছেদটি (যেটি একটু আগেই উদ্ধৃত হয়েছে) আর নেই।

বোধোদয়-এর দ্বিতীয় সংস্করণে আরও তিন পৃষ্ঠায় (৪৯, ৬২, ৭০)-য় 'ঈশ্বর'-এর কথা ছিল। নবম সংস্করণে সেগুলির অবস্থা কী দাঁড়াল?

কিন্তু কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের নিয়ম ভীষণ কড়া: তেইশ পৃষ্ঠার বেশি প্রিন্ট পাওয়া যাবে না। খাতির নদারদ। সুতরাং আমার তরুণ বন্ধু অনিমেষ গুপ্ত বিস্তর চেষ্টা করেও বোধোদয়-এর নবম সংস্করণ-এর বাকি অংশ হাতে পান নি। তাই অন্য তিনটি জায়গায় 'ঈশ্বর' শব্দটি আছে না নেই — তা বলা যাচ্ছে না।

রচনাপঞ্জি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বোধোদয় । দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫২।

—। বোধোদয় । নবম সংস্করণ, ১৮৫৭।

—। রচনাসংগ্রহ । গোপাল হালদার সম্পা.। বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, প্রথম খণ্ড, ১৯৭২।

—। রচনাসমগ্র । তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পা.। মেদিনীপুর : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগ, ২০১৬।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। । বিদ্যাসাগর । কলেজ স্ট্রীট, ১৩৯৪ ব.।

পরমেশ আচার্য। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর। শারদীয় অনুষ্টুপ ১৩৯১ ব.।

উমা

আমাদের উৎস মানুষ...

চার দশক পার করা উৎস মানুষ-এর পুরনো সাথীরা লিখবেন পত্রিকা সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতির কথা। এই সংখ্যায় রইলেন লেখক **স্বপ্নময় চক্রবর্তী**

আমার প্রথম বই একটি ছোটগল্প সংকলন 'ভূমিসূত্র' ১৯৮২ সালে বের হয়। উৎস মানুষ তখন এক বছরের শিশু। কিন্তু এই পত্রিকাটি শৈশবেই দামাল। প্রথম কবে উৎস মানুষ হাতে পেয়েছি মনে নেই। হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থ সংখ্যা থেকেই। স্টল থেকে প্রায়ই কিনতাম।

আমি আবহাওয়া দপ্তর ছেড়ে আকাশবাণীতে কাজ করি ১৯৮০ থেকে। বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানের প্রধান ছিলেন অমিত চক্রবর্তী। ওঁর কাছেই শুনলাম উৎস মানুষের সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণীতে বিজ্ঞান বিভাগেই কাজ করেছেন কিছুদিন। তখন বিজ্ঞান বিভাগে নতুন। কি ভাবে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান গুলো করে, তার ফর্ম্যাট কি হবে, কোনটা কতক্ষণের হবে সে সব পরিকল্পনায় অশোকের অনেকটাই অবদান ছিল। পরে আমিও বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হয়েছিলাম এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক অনুষ্ঠান গুলি খুব একটা পরিবর্তন করিনি।

আকাশবাণী ছেড়ে গেলেও বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে অশোকের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্রচুর অনুষ্ঠান করেছেন। এবং উৎস মানুষ পত্রিকাটি আকাশবাণীর বিজ্ঞান অনুষ্ঠান গুলির পরিকল্পনায় সাহায্য করে গেছে। উৎস মানুষের একটা তত্ব ছিল কোয়াক ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চিকিৎসাটা একটু ভাল করা। এ বক্তব্য নিয়ে আকাশবানীও অনুষ্ঠান করেছে। ওঝাদের সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেয়া উৎস মানুষের তত্ব ছিল। আমরা মানে আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগ এটা গ্রহণ করেছিল।

খাবারের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করা হয়েছে যদিও কাজ তেমন হয়নি। বিজ্ঞান যে শুধু কলকব্জা নয়,যন্ত্রপাতি নয়, জটিল তত্ব নয়, বিজ্ঞান মানে যুক্তি মেনে চলা সমাজ বিধান। প্রকৃতি নিয়ত সাম্য রচনা করে, ইকুইলিব্রিয়াম, সমাজেও একটা সাম্য রচনা করাটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই সাম্য রচনায় বাধা দেয় যারা তারা বিজ্ঞানমনস্ক নয় এটা উৎস মানুষের বিশ্বাস। তাই হিরোশিমা নিয়ে একাধিক লেখা, বছর বছর বন্যা নিয়ে বিশেষ সংখ্যা, হারিয়ে যাওয়া ধান, সাপ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা, জ্যোতিষীদের ভাওঁতা, তাগা-তাবিজ-কবজ-মাদুলি-ঝাড়ফুঁক, ন্যাবার মালা, বিয়ে বাড়িতে উপহার দেওয়া নেওয়া, পণপ্রথা, হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান, ডাক্তার-রুগী সম্পর্ক, বিদ্যে জাহির করা,ভদ্রলোক-ছোটলোক নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে খন্ডন করা এরকম সব সামাজিক বিষয়কে উৎস মানুষ ফর্ম্যাটে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সামাজিক উপদেশমূলক বাংলার প্রচলিত ছড়াগুলোকে এক মলাটের ভেতর এনে মানুষের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের পাল্টা হিসেবে পুনর্মুদ্রণ করেছে। গল্পও ছাপতো। উৎস মানুষ পত্রিকায় আমি পাঁচ/ছ'টা গল্প লিখেছি মনে পড়ে। উৎস মানুষকে ঘিরে একটা আন্দোলনই গড়ে উঠেছিল এক সময়। কত নতুন নতুন কাগজ বেরিয়েছে গত শতকের আট-নয়ের দশকে - যুক্তিবাদী, বিবর্তন, টপ কোয়ার্ক, স্বাস্থ্যবার্তা।.. এরকম আরও কত।

উৎস মানুষ মাঝখানে ২০০৪/২০০৫-এ একটু অনিয়মিত হয়ে পড়ে তখন মনে হয়েছিল কি যেন হারালাম। যদিও ঐ সময় নেট সংস্করণ চালু ছিল; তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা - যৌনদাসীদের নিয়ে, শান্তিনিকেতন নিয়ে, আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞান, বেরিয়েছিল।

অশোকের অকাল প্রয়াণের পরে উৎস মানুষ এখনও নিয়মিত বেরোচ্ছে। কিন্তু কেন যেন মনে হয় সে এক উজ্জ্বল সময় ছিল...

চিকিৎসক–রুগীর সুসম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ

অরুণালোক ভট্টাচার্য

দৃশ্য-১

পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সকাল আটটা বাজতে না বাজতে ডাক্তারবাবু কোনোরকমে কাকচান সেরে, মুখে দুটো রুটি–তরকারি গুঁজে তৈরি হচ্ছেন আউটডোরে বসার জন্যে। আউটডোর শুরু করতে করতে নটা–সাড়ে নটা বেজেই যায়। সঙ্গে সুখ–দুঃখের সঙ্গী প্রবীণ ফার্মাসিস্ট ও একজন নার্সিং স্টাফ। বিকেল চারটে–সাড়ে চারটে বেজে যায় আউটডোরের রোগী সামলে উঠতে। মাঝে চা জলপান ধূমপানের বিরতি। দূরদূরান্ত থেকে আসা রুগীদের অপেক্ষা করাতেও মন চায় না। হেল্‌থ সেন্টারের চৌহদ্দির দুটো অশ্বত্থ আর তেঁতুল গাছ কতটুকুই বা ছায়া দিতে পারে? রোদে, জলে, রোগে ক্লিষ্ট অসহায় মুখগুলো। গড়ে রুগী দেখতে হয় দেড়শো থেকে দুশো। ছ ঘণ্টায় দুশো রুগী দেখতে হলে, রুগীপ্রতি সময় দু মিনিট। ঐ দু মিনিটে রুগীর কষ্ট শুনতে হবে, তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ওষুধ লিখতে হবে। তা করতে করতে, পরের রুগী অধৈর্য হয়ে হৈচৈ লাগিয়ে দেয়। ডাক্তারবাবুর খুব ইচ্ছে করে, রুগী বা তার বাড়ির লোককে রোগ সম্বন্ধে দু–চারটে কথা জানাতে। চাকরির প্রথম জীবনে চেষ্টাও করেছেন কয়েক মাস। আউটডোর শেষ হতে হতে সন্ধে গড়িয়ে যেত। মুখে প্রকাশ না করলেও অন্য কর্মচারীরা যে খুব খুশি হতেন না, সেটা ডাক্তারবাবু বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। শেষে ফার্মাসিস্ট ভদ্রলোক একদিন বলেই ফেললেন, 'ডাক্তারবাবু এদের অত বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই। এদের কাছে ক্যান্সারও যা, আমাশাও তাই। সারবে কিনা সেটাই হল মোদ্দা কথা। আপনি নতুন চাকরি করছেন, বিয়ে–থা করেননি, ঘরের টান নেই, হেল্‌থ সেন্টারে পড়ে থাকতে পারেন। নার্স দিদিমণির ঘরে দুটো বাচ্চা, শাশুড়ি চোখে দেখে না, বরটা ছোটখাটো ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ— ওকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। আমিও একটু দূরের গ্রামে একটু–আধটু প্র্যাক্টিস করি।' সেই দিন থেকে ডাক্তারবাবু বুঝলেন, এই পরিবেশে রুগীকে রোগ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য ন্যূনতম প্রয়াস আর সোনার পাথরবাটিতে পায়েস খাওয়া, একই ব্যাপার। অতএব শোনো দেখো লেখো–র পরম্পরাই বহাল। অসহায় রুগীদের কাছে ডাক্তারবাবু এক জাদুকর, যিনি চমৎকার উপায়ে রোগ সারান। হয় তাঁকে ভগবানের মতো পুজো করা উচিত, নচেৎ শয়তানের মতো ঘৃণা করা উচিত। কারণ তিনি রুগীদের মতো 'মানুষ' হয়ে উঠতে পারবেন না কোনোদিন।

দৃশ্য-২

শহর কলকাতা। বেসরকারি ঝাঁ–চকচকে হাসপাতাল। হাসপাতালের পার্কিং লটে গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া যায় না। বাইরের রাস্তাতেও জায়গা পাওয়া দুষ্কর। রুগীর গাড়ি আর ডাক্তারবাবুদের গাড়ির জমজমাট মেলা। হাসপাতালের ভেতরে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শীতল পরিবেশ। সুন্দরী অভ্যর্থনা কর্মচারীর কাউন্টারে যথাযোগ্য সম্মান দক্ষিণা দিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখানোর অনুমতি মেলে। নির্দিষ্ট কক্ষের সামনে বসে থাকেন অপেক্ষারত রুগীরা। ডাক্তারবাবু সকালে এসে রাউন্ডে যান। ওয়ার্ডের রাউন্ড সেরে ফিরে, নিজের আউটডোরের চেম্বার। সময়ের ঠিক থাকে না। প্রতীক্ষার অবসানে অধৈর্য, অবসন্ন রুগী ডাক্তারবাবুর মুখোমুখি। তারপর পরীক্ষা–নিরীক্ষার গোলোকধাঁধা পেরিয়ে যেতে বেলা গড়িয়ে যায়। ততক্ষণে ডাক্তারবাবু হয় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান বা অপারেশন থিয়েটারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রুগীর কপালে জোটে অন্য আর একদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, রিপোর্ট দেখানোর জন্য। চিকিৎসা চালু হয় বটে, কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রেই রোগের উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে। রোগ নিয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা মেলে না। সেটা হয়তো মেলে বিভিন্নরকম পরীক্ষা–নিরীক্ষার পরে। রোগ–নিরাময়ের আশা–আশঙ্কায় দোদুল্যমানতার মধ্যেই রুগীর ছেঁড়া–ছেঁড়া রাত্রির ঘুম। ডাক্তারবাবু যে পরিষ্কার করে রোগ সম্বন্ধে কিছু বললেন না যে!

প্রাণসৃষ্টির সেই আদিম যুগ থেকেই পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান হল প্রাণিজগতের বিবর্তনের এক সোপান। মনুষ্যজাতির চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তার পারস্পরিক ভাব আদান–প্রদানের প্রক্রিয়াও বদলে গেছে। এখনও যাচ্ছে। মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং যোগাযোগের মূলে কিন্তু রয়েছে ভাবের এই আদান–প্রদান। আমরা আমাদের চিন্তন প্রকাশ করি বিভিন্নভাবে— যেমন ধরুন, কথা বলে, হাতে লিখে, শারীরিক বিভঙ্গে, চোখের ইশারায় বা কখনও কখনও ছবি বা অঙ্কনের মাধ্যমে। তবে এই প্রকাশের মাধ্যমটি যেভাবে আঙ্কিক নিয়মে বর্ণিত হল, সবসময় ঠিক সেভাবে হয় না। একটি আরেকটির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু কথ্য ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বাচন এবং স্বরক্ষেপণ এইসব ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চিকিৎসকদের কথা বলার ধরন এবং সেই কথা কতটা প্রাঞ্জলভাবে বলা হচ্ছে এবং

তা রুগীদের মননে কতটা প্রভাব ফেলছে,তার ওপরে কিন্তু রুগী–চিকিৎসকের সম্পর্ক অনেকটাই নির্ভরশীল।

যে কোনও রোগের চিকিৎসায়, রোগ বা রুগীর পরিণতি যাই হোক না কেন, চিকিৎসক–রুগীর সম্পর্ক একটা বড় ভূমিকা নেয়। সমাজ এই সম্পর্কটিকে কনজিউমার বা পণ্যের গোত্রভুক্ত করে ফেলেছে। বিকিকিনির ভাষায় আমি পঞ্চাশ টাকা খরচ করে, কয়েক গ্রাম বা কিছু মিলি সেবা কিনতে চাইছি। সেবার তো পরিমাপ করা এইভাবে সম্ভব নয়। এইখানেই আসে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও তালমেল। যেহেতু সেবার কোনও পরিমাপ হতে পরে না, সেইজন্যে ভোক্তার কোনও স্পষ্ট ধারণা থাকে না যে, কতটা সেবা ঐ পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে তিনি পেতে পারেন বা পাওয়া উচিত। যেহেতু এ ব্যাপারে সমাজ হাত ধুয়ে ফেলেছে, দায়িত্ব বর্তায় চিকিৎসকদের ওপরে এবং কিছুটা হলেও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপরে। সুতরাং, আবার সেই কমিউনিকেশন বা তথ্য আদান–প্রদানের প্রশ্ন। যে কোনো চিকিৎসার কেন্দ্রবিন্দু হলেন রুগী। তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হয় ডাক্তারবাবু এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্রিয়াকলাপ। চিকিৎসার আদিতে হিপোক্রেটিস সাহেবের মেডিকেল স্কুলেও রুগীকেন্দ্রিক এই চিকিৎসাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে এই ব্যবস্থার থেকে চ্যুতি ঘটে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। তখন মনে করা হত, ক্যান্সার আক্রান্ত রুগীদের রোগ সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবহিত করলে, তা চিকিৎসার পরিপন্থি হতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা ক্ষতিকারকও হতে পারে। কিন্তু তথ্যের অধিকারবোধ এবং ক্রেতাসুরক্ষা আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে যে তথ্যের আদান–প্রদানই রুগীর সঙ্গে চিকিৎসকদের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রেও রুগীর পরামর্শ এবং মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মোটের ওপর আজকাল চিকিৎসা আর মোটেই ডাক্তারকেন্দ্রিক নয়, পুরোটাই রুগীকেন্দ্রিক। অতএব চিকিৎসা করা ছাড়াও চিকিৎসকের অন্যতম দায়িত্ব হল রুগীদের সঙ্গে তথ্যের আদানপ্রদান করা।[১]

এবারে আমরা একটু আলোচনা করে নেব এই আদান–প্রদান কতটা ফলপ্রদ এবং কার্যকর। এই আদান–প্রদানের উদ্দেশ্য মূলত তিনটি। প্রথমত, রুগী–চিকিৎসকের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। দ্বিতীয়ত, রুগী তাঁর রোগ এবং চিকিৎসার যাবতীয় তথ্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে রুগীর মতামত গ্রহণ করে চিকিৎসার রকমফের ঘটানো হয়। আর এই সম্পর্কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় চিকিৎসকের সঙ্গে রুগীর প্রথম মোলাকাতের ক্ষণ থেকেই। তাঁর ব্যবহার, রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা ও পদ্ধতি, রোগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, চিকিৎসার আধুনিক এবং নবতম সংস্করণের বিষয়ে অবহিত থাকা— এসবই একজন চিকিৎসক সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে, সুষ্ঠু এবং ফলপ্রসূ আদান–প্রদানের বিভিন্নরকম সুফল পাওয়া গেছে। যেমন ধরুন, রুগীর পরিতুষ্টি বা চিকিৎসার ত্রুটি সম্বন্ধীয় অভিযোগের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাওয়া। এ সব তো আছেই। এছাড়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সুফল হল— রুগীর বেদনা বোধ কম হওয়া, দ্রুত আরোগ্যপ্রাপ্তি, তাড়াতাড়ি কর্মক্ষমতা ফিরে পাওয়া সর্বোপরি হাসপাতালে থাকার দিন কমে আসা। সন্তোষজনক তথ্য আদান–প্রদানের কিছু অদৃশ্য উপকারিতা চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, কার্যক্ষেত্রে মানসিক সন্তুষ্টি, কাজ সম্বন্ধীয় মানসিক চাপ অনেকটাই হ্রাস পাওয়া ও তার ফলে কাজের গুণগত মান বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।[১]

তাহলে সমস্যাটা ঠিক কোথায়? ফলদায়ী তথ্যের আদান–প্রদানে, চিকিৎসক এবং রুগীর পারস্পরিক সম্পর্কের আদান–প্রদানে ঘাটতিটা ঠিক কোন জায়গায়?এটা লক্ষ্য করা গেছে, যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তারবাবুর রুগীদের সঙ্গে ভাবের আদান–প্রদানের ধার এবং ভার দুটোই কমতে থাকে। আমাদের দেশে সুচিকিৎসক হলেই তাঁকে ভগবানের আসনে বসিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা থাকে।

ক্রমবর্ধমান রুগী এবং ভগবৎ সদৃশ শ্লাঘাবোধ— দুয়ের চাপে রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা পিষ্ট হতে থাকে। চিকিৎসা তখন হয়ে পড়ে চিকিৎসককেন্দ্রিক, রুগী বা রোগকেন্দ্রিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য রুগী বা রুগীর পরিবারের কাছে পৌঁছয় না। যেমন ধরুন, একজন মৃতপ্রায় রুগী। চিকিৎসক বুঝতে পারছেন, এই রুগীর বাঁচা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই ব্যাপারটা তিনি রুগীর পরিজনদের কতটা বোঝাতে পারছেন, সেই ব্যাপারটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের রুগীর পরিবারকে বোঝাতে না পারার কয়েকটি কারণের প্রতি আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের সম্যক এবং সাম্প্রতিকতম জ্ঞানের অভাব। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসকের রুগীর আশঙ্কাজনক পরিণতির কথা বলতে দ্বিধা। তৃতীয়ত, চিকিৎসকের তথ্য আদান–প্রদান করার দক্ষতার বা পরিভাষায় বলতে গেলে কমিউনিকেশন স্কিলের অভাব। আমাদের দেশে ডাক্তারি শিক্ষাক্রমে এই তথ্য আদান–প্রদানের ব্যাপারটি সেভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এই দক্ষতাটি জুনিয়র ডাক্তারবাবুদের নিজেদেরই আহরণ করতে হয়। তিনি সেটি করেন তাঁর সিনিয়রদের দেখে, সঙ্গে নিজের মনন মিশিয়ে। সুতরাং গোড়াতেই গলদ! হু (WHO) যেখানে বলছে, প্রতি হাজার জনে একজন চিকিৎসকের থাকা আবশ্যিক, সেখানে আমাদের দেশে একজন সরকারি চিকিৎসককে দেখতে হয় দশ হাজার রুগী। বেসরকারি এবং অন্যান্য চিকিৎসককে নিয়ে সংখ্যাটা একটু বাড়তে পারে, তবুও সেটি প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। পাঠক, প্রথমে উল্লিখিত ঘটনাটি স্মরণ করুন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে,

যেখানে চিকিৎসক রুগী দেখার সময়ই করে উঠতে পারছেন না, সেখানে রুগীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় বার করাটা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা মানেই শুধুমাত্র ওষুধ আর কাটা-ছেঁড়া নয়, রুগীকে রোগ সম্বন্ধে সম্যক একটা ধারণা দেওয়াটাও চিকিৎসারই অঙ্গ। আমাদের দেশে চিকিৎসক আর রুগীর সংযোগ ঘটানোর আর এক অন্তরায় হল ভাষা। ভারতে সংবিধান-স্বীকৃত ভাষা হল ২২টি। আর আধুনিক ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে, ছাত্রদের এক রাজ্য থেকে প্রায়শই চলে যেতে হচ্ছে অন্য একটি রাজ্যের কলেজে। ফলত, ভাবের আদান-প্রদান ঘটানোর ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বা কথ্যভাষা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই রুগী এবং ডাক্তারবাবু উভয়েরই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। রুগী এবং তাঁর পরিবারবর্গের কাছে রোগ সম্বন্ধে তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে চিকিৎসকের। কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ধারণা হতেই পারে যে রোগ সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য রুগীকে জানানোটা হয়তো প্রয়োজনীয় নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো সমীচিনও নয়। কিন্তু এই ধারণা সমকালীন চিকিৎসাব্যবস্থায় পোষণ করা বোধহয় ঠিক নয়। তথ্য জানার অধিকার আইনগতভাবে এখন সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রযুক্তির কল্যাণে, পৃথিবীর সব প্রান্তের সবরকম তথ্য এখন মানুষের করতলগত। সুতরাং অসম্পূর্ণ তথ্য রুগীর মনে শুধুমাত্র সন্দেহর উদ্রেক ঘটাবে তাই নয়, চিকিৎসকের প্রতি রুগীর বিশ্বাসভঙ্গ ঘটাতে পারে।

আত্মকেন্দ্রিক এবং অবিশ্বাসের এই বাতাবরণে চিকিৎসকের প্রতি রুগীর এই মনোভাবের ফলাফল কিন্তু সুদূরপ্রসারী। মৃতপ্রায় মানুষকে জীবনদায়ী ইঞ্জেকশন দিলেও যে মানুষটির মৃত্যু সবসময় আটকানো যাবে না— এই সুস্থ ও সুষম চিন্তাভাবনা তখন লোপ পায়। অবিশ্বাসের শয়তানরূপটি তখনে মনে মনে বলতে থাকে যে ইঞ্জেকশনের কারণেই মানুষটির মৃত্যু হয়েছে। শুরু হয় অশান্তি, মামলা-মোকদ্দমা। এ অনেকটা গড়িয়ে পড়া তুষারগোলকের মতো। যত নিম্নগামী, ততই তার আকার এবং প্রকার বাড়তে থাকে। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, একটি শিশুর বমি হচ্ছে। বমির অনেক কারণ থাকতেই পারে। রুগীকে দেখে-শুনে চিকিৎসকের মনে হল, এটি পেট খারাপ সম্বন্ধীয় বমি। রোগনির্ণয় করতে চিকিৎসক তাঁর অধীত বিদ্যা এবং সার্বিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন। তিনি রুগীর পরিজনদের ব্যাপারটি বুঝিয়ে একটি বমির ওষুধ দিলেন। এও বললেন যে, বমি কমলে শিশুটর পেট খারাপ হতে পরে, যা নাকি রোগেরই একটি পর্যায়ক্রম। রুগীর পরিজনেরা কম্পিউটার ঘেঁটে দেখলেন যে বমির ওষুধের দশ নম্বর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে, হাজার জনের মধ্যে একজনের পেট খারাপ হওয়ার কথা লেখা আছে। এইবারে প্রশ্ন হল, তাহলে পেট খারাপ যে হল, তা কি রোগেরই একটি উপসর্গ, নাকি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এই প্রশ্নের কোনো চটজলদি উত্তর হয় না। এইখানেই একটা বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন উঠে আসে। পারস্পরিক ভাবের আদান- প্রদান ঘটিয়ে এই বিশ্বাসের জায়গা ফিরিয়ে না আনলে বিস্তর সমস্যা।[২]

তাহলে চিকিৎসক-রুগীর এই আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসককেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এটা চটজলদি কোনো ঘটনা নয়। রুগীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই চিকিৎসককে সজাগ থাকতে হবে। রোগের বিষয়ে জানা থেকে শুরু করে, রুগীকে পরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করা পর্যন্ত, চিকিৎসকের কথোপকথন, ব্যবহার, তাঁর শরীরী পরিভাষা পরিজনদের সঙ্গে উপসর্গ নিয়ে আলোচনা— সবকিছুর মধ্যে দিয়েই চিকিৎসক রুগী বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেন। একদম প্রাথমিক অবস্থায় এই সম্পর্ক স্থাপন করাটা পরবর্তীকালে রুগীর এবং তাঁর পরিবারের আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকটাই সদর্থক ভূমিকা নেয়। রুগীর মনে প্রাথমিক প্রভাব বিস্তার করার পরের ধাপ হল, চিকিৎসকের রোগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা। পহলে দর্শনদারি হলেও, পরবর্তীতে চিকিৎসকের মূল পরিচয় হয় তাঁর চিকিৎসা-জ্ঞানে। যে কোনো রকমের চিকিৎসা হওয়া উচিত একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক। সেই পরিকল্পনা বা ছকটি আলোচনা করতে হবে রুগী বা তার পরিজনের সঙ্গে। প্রয়োজনে রুগীর পরামর্শ বা উপদেশ মেনে, সেই প্ল্যান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হতে পারে। আপাতভাবে পুরো ব্যাপারটাকে খুবই অবাস্তব বলে মনে হলেও, পরিবর্তিত ধারণায় রুগী বা রুগীর পরিজন চিকিৎসার পরিকল্পনা ছকতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। এরপরের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল— খারাপ রোগের সম্বন্ধে আলোচনার ধরন। যাবতীয় চিকিৎসা সত্ত্বেও কোনো কোনো রোগের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। সেই তথ্যটি জানানোর জন্যে চিকিৎসকের নিজের কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। সাধরণ মানুষ প্রিয়জনের সম্বন্ধে কোনো খারাপ খবর শুনলে যেরকম প্রতিক্রিয়া দেখান, তার একটি ধরন আছে। একদম প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় রুগীর পরিজনেরা কিছুটা থমকে গিয়ে অন্তিম পরিণতি অস্বীকার করতে চান। পরবর্তী প্রতিক্রিয়াতেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। হতাশা কেটে গিয়ে জন্ম নেয় ক্রোধ। ক্রোধ সম্বরণ করার মানসিক দৃঢ়তা সকলের থাকে না। অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধের আগুনে মাঝে মাঝেই পুড়তে হয় চিকিৎসকদের— সম্পূর্ণ বিনা কারণেই। রুগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে যেহেতু কোনো আড়াল থাকে না, আগুনের আঁচটাও তাই চিকিৎসকদের গায়েই লাগে। সারা পৃথিবী জুড়েই ডাক্তারির এ এক অদ্ভুত পেশাগত ঝামেলা। যদি এই ক্রোধভাব সামলে ওঠা যায়, পরবর্তী প্রতিক্রিয়াটি হল গভীর দুঃখবোধ। এখানেও ডাক্তারবাবুকে হতে হয় যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল।

পরবর্তী পর্যায়ে মানসিকভাবে রোগের এবং রুগীর পরিণতি মেনে নেন পরিজনেরা। সবশেষে তাঁরা শুনতে চান কিছু আশার কথা।[৩]

আমার এক বন্ধু, বর্তমানে ইংল্যান্ড প্রবাসী সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে. তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, ওদের কীরকমভাবে রুগীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হয়। একটু হেসে বললো, আর কদিন পরে ডাক্তার থেকে অ্যাক্টর হয়ে যাব মনে হয়। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার। প্রথমত, রুগীর সামনাসামনি বসা যাবে না। তাহলে নাকি একটা পক্ষ-প্রতিপক্ষ, মানে বিতর্কের আবহ তৈরি হয়। মানে রুগীকে চিকিৎসকের পাশে বসাতে হবে। ধ্যাড়ধেড়ে জামাকাপড় পড়লে চলবে না। একটু ধোপদুরস্ত থাকতে হবে। চোখে থাকতে হবে ভরসার কমনীয়তা। মুখে ঝুলবে আশ্বস্ত-ভরা মৃদু হাসি। গলায় স্বরটা বাস আর ব্যারিটোনের মাঝামাঝি রেখে কথা চালাতে হবে। নয়নে নয়ন মিলিয়ে কথা বলতে হবে। কথা বলার গতিবেগ হবে ৩০ সেকেন্ডের পাল্‌স, তারপরে ১০ সেকেন্ডের বিরতি। কেন এই অদ্ভুত চক্র? কারণ, এই বিরতি বা পজের সময়টুকুতে রুগী বা রুগীর পরিজনেরা অনুধাবন করবেন, রোগ গুরুত্ব। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা তাঁদের মতামতও জানাতে পারবেন।

যথাসম্ভব কথাবার্তা চালাতে হবে রুগীর ভাষায় বা কথ্য ভাষায়। ওদের দেশের পরিসংখ্যান নাকি বলছে, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমার বেশিরভাগটাই নাকি অসফল তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য। চিকিৎসার গাফিলতি সেখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় না। বন্ধুটির বাচনে ব্যঙ্গের আভাসে বুঝলাম— ওরাও খুব স্বস্তিতে নেই।

আমাদের দেশের সমস্যাটি আরো জটিল। আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে দুটি সংস্থা— সরকারি ও বেসরকারি। দেশের বিপুল জনসংখ্যার সুষ্ঠু চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়া আমাদের সরকারের পক্ষে অসম্ভব। ফলে বাড়বাড়ন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলোর। সেখানে নেই কোনো নিয়ামক সংস্থা। ফলে স্বভাবিকভাবেই সেখানে অনিয়মের ভ্রূকুটি। সারা পৃথিবীতে চিকিৎসার ভরকেন্দ্র হলেন রুগী এবং তাঁর পরিবার। তাঁদের ঘিরে আবর্তিত হবে চিকিৎসার যাবতীয় পরিকল্পনা। এই ভাবনাটা সকলেই আজকাল ভাবছেন এবং আপামর জনসাধরণের মনে আস্তে আস্তে সেই

সুরই বাঁধা হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসক এবং চিকিৎসা যে ভৌতিক বা দৈবিক কোনো ব্যাপার নয়, পুরোটাই মানবিক— এই মনন যখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই মনুষ্যকৃত কাজের মূল্যায়নের একটা দায়ও থেকে যাবে। চিকিৎসা এমন একটা জিনিস, যা অসফল হলে মানুষ ক্লিষ্ট হন। যে কোনোরকম কষ্ট এবং পীড়া মানুষকে তার কারণ খুঁজে বার করার জন্য নিরন্তর ভাবিয়ে চলে। সেই কারণগুলো সবসময় যে খুব প্রাঞ্জল, তা কিন্তু নয়। একে তো চিকিৎসা এবং রোগের ব্যাপারটা চটজলদি বোঝা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবসময়ে দুয়ে দুয়ে চার হিসাবে অঙ্ক মেলে না। এই বোধটা রুগীকে বিশ্বাস করানোটাই হল কমিউনিকেশন বা ভাব ও তথ্যের আদান-প্রদানের প্রধান কার্যকারিতা। এই সেতুবন্ধনটি ঠিকমতো না হলেই, সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কালসাপ ঢুকে পরে রুগী এবং তার পরিজনের মনে। এই সন্দেহের ফলে শুরু হয় মামলা-মোকদ্দমা, কোথাও ঝগড়াঝাঁটি মারপিট। ল্যানসেট পত্রিকা ২০১৮র মে মাসের সংখ্যায় জানাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে, ইংল্যান্ডের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বা ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিস শুধুমাত্র চিকিৎসার গাফিলতি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড খরচ করেছে! ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মামলাবাবদ ক্ষতিপূরণের দাবির মোট পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা! এবং আরো আশঙ্কার কথা হল, এই পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত আরও দানবীয় আকৃতি নেবে। এবার আমরা এই অসন্তুষ্টির ব্যাপারটি যদি আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবি। যাঁদের ক্ষমতা আছে, তাঁরা মামলা করবেন, আর যাঁরা মামলা করতে অপারগ বা মামলার ফলাফলে বিশ্বাসী নন, তাঁরা ডাক্তার-নিগ্রহ বা হাসপাতাল ভাঙচুরের পথ বেছে নেবেন। ইংল্যান্ড-আমেরিকার মতো তথাকথিত সভ্য, উন্নত দেশই যদি এই সমস্যা সমাধানে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের মতো দেশ, যেখানে মানুষপ্রতি চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্য, যেখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় একটা জগাখিচুড়ি নিয়ন্ত্রণ, যেখানে স্বাস্থ্য আইন অনেক ক্ষেত্রেই ঝাপসা— সেখানে চিকিৎসক-রুগীর সম্পর্ক জটিলতর হতে বাধ্য।[৪]

রুগী এবং তাঁর পরিজনের অজ্ঞান-অনিশ্চয়তা-অবিশ্বাসের বীজ থেকে অসূয়ার যে মহীরুহ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে শুরু করে, তা বিরত করার দায় কিন্তু অনেকটাই চিকিৎসকের হাতে। রোগের তথ্য এবং চিকিৎসার পরিকল্পনার ব্যাপারে অকপট আলোচনা, সঠিক কমুনিকেশন এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমেই এর সমাধান কিছুটা হতে পারে। এর সঙ্গে আরও দরকার সরকার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রকদের দূরদর্শিতা এবং প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত। একবার যুদ্ধ শুরু হলে, দিনের শেষে কিন্তু হাতে পেন্সিল ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

১. Doctor-Patient Communication: A Review Jennifer Fong Ha, MBBS (Hons), Dip Surg Anat, Nancy Longnecker, PhD Ochsner J. 2010 Spring; 10(1): 38-43.

২. The importance of good communication between patient and health professionals. Markides M J Pediatr Hematol Oncol. 2011 Oct; 33 Suppl 2:S123-5.

৩. Communication— Anil Garg, Sibaprasad MRCPH Clinical examination— a practical guide Paul. pg 10-15

8. Medical negligence-0there are no winners-The Lancet-Editorial-Volume-391, Issue-10135, P-2079. May26, 2018

উমা

নিউটন মহাকর্ষসূত্র অথ মন্ত্রী কথন

সুশান্ত মজুমদার

বেচারা নিউটন। এতদিনের মুকুটখানা বোধহয় তাঁর হাতছাড়া, থুড়ি মাথাছাড়া হতে চলেছে। পৃথিবীর সবাই মেনে নিয়েছিল, মহাকর্ষসূত্রের আবিষ্কারক তিনিই। এখন ভারতের মন্ত্রী মহোদয়রা যে সমস্ত 'অকাট্য প্রমাণ' হাজির করছেন, তাতে মনে হয়, আর বেশিদিন তাঁর মাথায় মুকুটটি শোভা পাবে না।[১]

কি দুর্ভাগ্য! আর আজকের ভারত তো আর সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত নয়। এই ভারত এখন চাঁদে রকেট পাঠাচ্ছে, পরমাণু বোমা ফাটাচ্ছে, তারা যদি বলে মহাকর্ষসূত্রের আবিষ্কার নিউটন করেন নি, তাহলে মহা বিপদ। না, বিপদটা নিউটনের নয়, আমাদের। কারণ এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আপামর শিক্ষিত ভারতবাসী মন্ত্রী মহোদয়দের কথা কোনোভাবেই বিশ্বাস করেন না। প্রসঙ্গত একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি: প্রায় ২৫–২৬ বছর আগে বিখ্যাত একটি মেয়েদের কলেজে একটি প্রদর্শনী দেখতে যেতে আমার এক বন্ধু অধ্যাপিকা অনুরোধ করেন। সেই প্রদর্শনীতে, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিষয়ক একটি পোস্টারের বিষয় ছিল— নিউটনের বহু আগেই আমাদের দেশে মহাকর্ষ সংক্রান্ত ধারণা ছিল। ঠিক মনে নেই, তবে যতদূর মনে হয় মহাকর্ষ সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের ধারণাই ছিল পোস্টারের বিষয়বস্তু। পাশে যে ছাত্রীটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, আধুনিক বিজ্ঞান কীভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে গ্রহণ করার আগে যাচাই করে নেয়। পরে আমার বন্ধুটি জানায়, ছাত্রীটির সঙ্গে আমার কথোপকথন শুনে এক প্রথিতযশা অধ্যাপিকার মন্তব্য ছিল— 'এইসব মানুষদের জন্যই দেশের কিছু হয় না!' গত কয়েক বছর ধরে, এই ধরনের মন্তব্য পড়ে বা শুনে মনে হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান গত তিন–চারশো বছরে কী পদ্ধতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তা নিয়ে আলোচনাটা জরুরি। খুব সংক্ষেপে, নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝবার একটা প্রচেষ্টা করব।

প্রাচীন ভারতে মহাকর্ষতত্ত্ব সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের (৫৯৮–৬৬৮) ধারণা ছিল এই রকম:

'প্রাজ্ঞজনেরা বলেন, স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী স্থানে পৃথিবীর অবস্থান এবং তার মধ্যেই ওপরে আছে দেবতাদের বাসস্থান মেরুপর্বত আর নীচে রয়েছে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্য–দানবের বাসস্থান বরবমুখ (বরবমুখ অর্থ ঘোড়া)। এই উপর আর নীচের ধারণাটি কিন্তু আপেক্ষিক। একে অস্বীকার করে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবী সব দিক থেকে একই রকম; পৃথিবীতে সব মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আর এক প্রাকৃতিক নিয়মে সব ভারী জিনিস পৃথিবীর উপর পড়ে, কারণ সব বস্তুকে আকর্ষণ ও ধরে রাখা পৃথিবীর একটা ধর্ম (nature of the earth)। যেমন জলের ধর্ম বয়ে চলা, আগুনের দগ্ধ করা, আর বাতাসের গতি সঞ্চার করা।'[২]

যাঁরা সামান্য বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেছেন (এখন তো মাধ্যমিকস্তরেই পড়ানো হয়), তাঁরা নিউটনের মহাকর্ষসূত্র কী জানেন। এই সূত্র শুধুমাত্র পৃথিবীর আকর্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, নিউটনের গতিবিদ্যার তিনটি সূত্রের মতো মহাকর্ষসূত্রও সার্বজনীন, অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সর্বত্র এই নিয়ম প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, নিউটনের সূত্রের সাহায্যে আমরা এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যেকার আকর্ষণ–বল পরিমাপ করতে পারি, যদি তাদের ভর আর তাদের মধ্যেকার দূরত্ব জানা থাকে। এটা জানা আছে বলেই আমরা মহাকাশযান পাঠাতে পারি, প্রয়োজন মতো উপগ্রহকে (স্যাটেলাইট) একটি নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপন করে আমাদের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে পারি। চন্দ্রযান–২ এর উৎক্ষেপণের সময় থেকে চাঁদের মাটিতে অবতরণের প্রচেষ্টা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই ইসরোর বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের গতিবিদ্যা আর মহাকর্ষ সূত্রগুলি ব্যবহার করে অঙ্ক কষেছেন। চাঁদে সফল অবতরণ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি নিউটনের হিসাবের ভুলে নয়, অন্য কোনো কারণে।

স্যর আইজাক নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) মহাগ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া'–র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৮৭ সালে। এখানেই তিনি বিস্তারিতভাবে তাঁর মহাকর্ষ ও গতিসূত্রগুলি প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহাকর্ষসূত্র প্রকাশের আগে কিন্তু কোপার্নিকাস প্রস্তাবিত সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের পরিকল্পনার বিশ্লেষণে তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ, ততদিনে গ্যালিলিও আর দেকার্তের হাত ধরে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা পেয়ে গিয়েছেন গতিবিদ্যা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা, যা নিউটনের হাতে পরিমার্জিত হয়ে রূপ পায় গতিবিদ্যার প্রথম দুটি সূত্র হিসাবে।[৩]

আমরা সকলেই জানি, একটা পাথরে দড়ি বেঁধে জোরে ঘোরাতে

ঘোরাতে হঠাৎ ছেড়ে দিলে, পাথরটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তাহলে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলি যদি সূর্যের চারিদিকে বন্ বন্ করে ঘোরে, তাহলে তারা কেন ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না? নিউটন যখন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র (১৬৬১ থেকে), তখন সেখানে তিনি দেকার্তের (René Descartes, ১৫৯৬–১৬৫০) লেখায় পড়ছেন যে, জোয়ার–ভাঁটার কারণ চাঁদের চাপ (তখনও মহাকর্ষ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা নামকরণ হয় নি)।[৪] আবার বয়েলের (Robert Boyle, ১৬২৭-৯১) লেখায় জানলেন যে— যদি চাপের কারণেই জোয়ার–ভাঁটা হয়, তাহলে তো ব্যারোমিটারে তা ধরা পড়ার কথা।[৫] এবার তিনি ভাবতে শুরু করলেন, অন্য কোন উপায়, তা মাপা যেতে পারে।

সাল ১৬৬৪ থেকে ১৬৬৬— এই দু বছরকে বলা হয় নিউটনের জীবনের 'বিস্ময় বছর'। এই দু বছরের মধ্যে তাঁর তিনটি কাজ আধুনিক বিজ্ঞানের ভিতকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। আর এই ভিতটি গড়ে উঠেছিল পর্যবেক্ষণ, যুক্তি আর গাণিতিক মডেল নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। মনে রাখতে হবে, ১৬৬৫ সালের গ্রীষ্মকালেই কেম্ব্রিজে প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে এবং এই সময়েই নিউটন প্রথমে বুথবে প্যাগনের (Boothby Pagnell) একটি খামার বাড়িতে থাকেন। পরে তিনি তাঁর মায়ের কাছে উলস্থর্পে চলে যান। এইসময়েই তিনি দ্বিপদ সমীকরণ, ক্যালকুলাসের প্রাথমিক ভিত্তি, রঙের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং সর্বোপরি মহাকর্ষ সংক্রান্ত কাজ করেন। নিউটনের নিজের কথায়— '...ওই একই বছরে (১৬৬৬) মহাকর্ষ (বল) চাঁদের কক্ষপথ পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা এই নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করি,... এবং গ্রহদের প্রদক্ষিণের পর্যায়কাল সংক্রান্ত কেপলারের সূত্রের ভিত্তিতে... আমি গণনা করে বের করি, একটি গ্রহকে তার কক্ষপথে ধরে রাখতে যে বল প্রয়োজন, তা যে কক্ষে সে প্রদক্ষিণ করছে, তার কেন্দ্র থেকে দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক; এবং এভাবেই চাঁদকে তার কক্ষপথে ধরে রাখতে পৃথিবীর ভূতলে কি পরিমাণ মহাকর্ষ বল দরকার, তাও গণনা করে ফেলি।'[৬]

নিউটনকে এই সূত্র আবিষ্কারের জন্য যে সমস্ত গণনা করতে হয়েছিল, তার জন্য প্রয়োজন ছিল দুটি নির্ভুল গণনার। এক, পৃথিবীর আয়তন, দুই, মহাকর্ষ জনিত ত্বরণের সঠিক পরিমাপ। প্রাথমিকভাবে এই দুটিই তিনি পেয়েছিলেন

গ্যালিলিওর (Galileo Galilei, ১৫৬৪-১৬৪২) গবেষণালব্ধ পরিমাপ থেকে। পরবর্তীকালে তিনি পেন্ডুলাম নিয়ে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে মহাকর্ষ জনিত ত্বরণের পরিমাপের বিস্তর সংশোধন করেন। তারও পরে তিনি বৃত্তের জ্যামিতি, গ্যালিলিওর গতি সম্পর্কিত ধারণা (সময়, ত্বরণ ও দূরত্ব— এই তিনের মধ্যেকার গাণিতিক সম্পর্ক) এবং হয়গিনসের (Christiaan Huygens,১৬২৯-৯৫) অপকেন্দ্র বলের ধারণার সাহায্যে মহাকর্ষ জনিত ত্বরণের পরিমাপকে আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। এবং তারপর, চাঁদকে কেন পৃথিবী তার মহাকর্ষ বলের সাহায্যে তার কক্ষপথে ধরে রাখতে পারছে, গাণিতিকভাবে নিরূপণ করেন। এইভাবে, নিউটনের মহাকর্ষসূত্র দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞানীদের কাছে মান্যতা পায়।

এখানে এই ইতিহাসটা লেখার মূল কারণ হচ্ছে, ব্যাপারটা বোঝা যে, আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র কিছু ধারণা বা স্পেকুলেশন নির্ভর নয়। এখানে আরেকটা ঐতিহাসিক বিতর্ককে সামনে আনলে বোঝা যাবে, কেন আমরা সকলে

বলি নিউটনই মহাকর্ষ বলের আবিষ্কর্তা। বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক (১৬৩৫–১৭০৩) ১৬৭৯ সালে নিউটনকে গ্রহদের গতিপথ নিয়ে পত্র আলোচনায় আহ্বান করেন। তিনি বিশেষভাবে চাইছিলেন, গ্রহদের নিজস্ব কক্ষপথে প্রদক্ষিণ এবং তাঁর গ্রন্থে (An Attempt to Prove the Motion of the Earth by Observations) উল্লিখিত 'কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ গতি' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নিউটন কী ভাবছেন তা জানতে। নিউটন অবশ্য এই আহ্বানে সাড়া দেন নি। কয়েকদিনের মধ্যে পাঠানো জবাবে তিনি লেখেন যে, বহুদিন তিনি এই সমস্ত বিষয় থেকে সরে এসেছেন এবং এখন এই বিষয় নিয়ে কোনো সময় ব্যয় করতে রাজি নন— '...I hope it will not be interpreted out of any unkindness to you or ye [the] R. Society that I am backward in engaging my self in these matters...'।[৭]

প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের পরে রবার্ট হুক অভিযোগ তোলেন, মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কারে নিউটন তাঁর ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। নিউটন এই অভিযোগ মানতে চাননি। তবে হুক নিজেও মহাকর্ষসূত্রের আবিষ্কর্তা হিসাবে

নিজেকে দাবি করেন নি, যা আমাদের নেতারা ভারতীয়দের আবিষ্কার হিসাবে করছেন। তিনি শুধু চেয়েছিলেন নিউটন স্বীকার করুন যে, মহাকর্ষ বলের পরিমাপ যে দূরত্বের সঙ্গে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হারে হ্রাস পায়, এই ধারণাটা প্রাথমিকভাবে তিনি হুকের কাছ থেকে লাভ করেছেন। প্রিন্সিপিয়া প্রকাশনার সময়কালে নিউটনকে লেখা একটি চিঠিতে হ্যালি (Edmond Halley, ১৬৫৬–১৭৪২) লিখেছেন— '...only Mr. Hooke seems to expect you should make some mention of him, in the preface,...।'[৮] কিন্তু নিউটন এই প্রভাবের গুরুত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তবে এই নিয়ে একটা বিতর্ক রয়েই গেছে— নিউটন রবার্ট হুকের ধারণা দ্বারা কোনোভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা।[৯]

পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল যে মহাকর্ষসূত্রের আবিষ্কর্তা হিসাবে নিউটনকেই মান্যতা দেন, তার কারণ হচ্ছে— ধারণা বা অনুমান

নয়, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সঠিক গণনা অথবা পরীক্ষালব্ধ নির্ভুল পরিমাপ, যা একই
অবস্থায় প্রত্যেকবার একই ফলাফল দেয়।১০ এই পথের জনক হিসাবে গ্যালিলিওকে মান্যতা দেওয়া হয় আর তারপর থেকে এই পথেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে।

টীকা:

১। Brahmagupta-II, not Isaac Newton, discovered gravity: Rajasthan education minister TNN | Jan 10, 2018, 03.47 AM IST https://timesofindia.indiatimes.com/india/a-bid-to-change-history-of-gravity-as-we-know-it/articleshow/62436479.cms

২. ALBERUNI &; S INDIA, DE. EDWARD C. SACHAU (ইংরাজি তর্জমা), পৃ ২৭২। এটি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

৩। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সুশান্ত মজুমদার, প্রসাদ রায় ও ভূপতি চক্রবর্তী(সম্পা), আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ, সম্পাদকমন্ডলীর নিবেদন ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গ্যালিলিও, নিউটন ও যান্ত্রিক বিশ্বদর্শন', অনুষ্টুপ প্রকাশনী।

৪ ও ৫। Richard S. Westfall, The Life of Isaac Newton, Cambridge University Press, Indian Edition, 1993, পৃ ২৭-২৮।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯

৭। পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৯

৮। পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৮

৯। যাঁরা হুকের দাবির সপক্ষে মতামত জানতে উৎসাহী তাঁরা Patterson, Louise Diehl. "Hooke&'s Gravitation Theory and Its Influence on Newton II: The Insufficiency of the Traditional Estimate." Isis, vol. 41, no. 1, 1950, pp. 32–45 দেখতে পারেন। এটি JSTOR পাওয়া যায়।

১০। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ (১৭৯৭-৯৮) করেন বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেনডিশ (১৭৩১-১৮১০)।

উমা

চীনকে ঠেকাতে ভারতকে দরকার আমেরিকার

শৈবাল কর

গত সেপ্টেম্বরে প্রচুর আড়ম্বরের সঙ্গে ভারত–মার্কিন যৌথ বৈঠক এবং আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির এক মঞ্চে অধিষ্ঠান মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ এবং সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব এবং বৈধতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে কোনো ত্রুটি হয় না। ভারত তুলনায় নব্য গণতান্ত্রিক। বয়স মাত্র ৭০ বছর। যদিও সাংবিধানিক স্রষ্টারা প্রায় নির্ভুল এবং অত্যন্ত আধুনিকমনস্ক এক রাষ্ট্র পরিচালন তত্ত্বের জন্ম এবং প্রয়োগ দেখিয়ে গিয়েছেন, এর মর্মার্থ ভারতবাসীর মনের গভীরে প্রোথিত হতে আরও ৭০ বছরের প্রয়োজন হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে 'দেশ' সম্বন্ধে অনুভূতি প্রগাঢ় নাই হতে পারে, তার উদাহরণ প্রচুর। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দেশ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব রয়েছে। নিজের মতন করে দেশকে বোঝার প্রয়াস এখানে রয়েছে বিপুলভাবেই। তবে অধিকাংশ দেশ–চেতনার মধ্যে রাষ্ট্রের দমন–পীড়ন ক্ষমতা এবং ধর্মের হুঙ্কার মিশে যে অধিকারবোধের জন্ম দেয়, সংবিধান সৃষ্টিকর্তারা ঠিক তেমনভাবে রাষ্ট্রকে কল্পনা করেছিলেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে ক্রমাগত।

উত্তর–আধুনিক, নব্য আমেরিকা ৯/১১র আক্রমণের পরে বদলেছে অনেকখানি। দেশভিত্তিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ আমেরিকাতে ছিল বরাবরই, বিশেষত ঠান্ডাযুদ্ধের সময়কাল থেকে কে শত্রু বা চিরশত্রু এবং কেই বা বন্ধু, তা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের জন্যে জরুরি বলে মনে করা হত। কিন্তু দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অবিশ্বাস ছিল নামমাত্র। আমেরিকা অভিবাসীদের দেশ। সে দেশে পা রেখে যদি একবার গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায়, তাহলে পরবর্তীকালে আর কেউ প্রশ্ন করে না নাম–গোত্র–দেশ বিষয়ে। সব মিলেই এক মার্কিন জনগোষ্ঠী। সেই সমন্বয়ে ফাটল ধরেছে ইদানীং। কে বেশি মার্কিন আর কে কম, কে দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর কেই বা উড়ে–এসে–জুড়ে বসেছে, তা নিয়ে নতুন টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ–অশ্বেতাঙ্গ বিভাজন যা গত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত উত্তাল করে রেখেছিল আমেরিকাকে, তারই নব্যরূপ বোধ হয় এই জাতিগত বিদ্বেষ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বর্ণভিত্তিক বিদ্বেষ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষতি বাড়তে থাকে।

বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেশ কিছু চাকরি সংরক্ষিত থাকত সাদাদের জন্যে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কালো মানুষেরা সে চাকরি পেতেন না। শ্বেতাঙ্গ প্রার্থী না পাওয়া গেলে পদ শূন্য থাকত। সহজবোধ্য যে, উৎপাদন বা পরিষেবা এতে ব্যাহত হবে এবং আর্থিক ক্ষতি হবে। এছাড়াও বর্ণবিদ্বেষের প্রচারক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসহযোগিতার সম্মুখীন হত। প্রতি বছর এ বাবদ ক্ষতি হত কয়েকশো কোটি ডলার। বর্ণবিদ্বেষ থেকে মুক্তির পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫% ছুঁয়েছে। এই বিষয়গুলো

অন্য দেশের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতাদের গোচরে থাকলেও তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এই ধারণাগুলো সেই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন রাজনৈতিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে ওঠে না সচরাচর। কারণ, তার জন্যে যে উন্নত গণতন্ত্রের প্রসার প্রয়োজন, তা উন্নয়নশীল দেশে অনেক সময়েই অমিল। বিশেষত, যখন বিভাজনের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বল করে কোনো দল ক্ষমতাসীন হয়, সে দেশে পরিস্থিতি প্রতিকূল।

মুখবন্ধটি কিছুটা ঘুরপথে গেলেও মুল বক্তব্য দুই বৃহৎ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন বিষয়ক। দুই রাষ্ট্রনেতার নতুন প্রয়াস ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে স্থায়িত্ব দেবে কিনা তা এই পরিবর্তনগুলোর উপর যতটা নির্ভর করে, ততটাই অবশ্য নির্ভর করে চীন এবং অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন কোনদিকে ঝুঁকছে তার উপরেও। সাধারণভাবে মনে করা যেতে পারে যে, পশ্চিমের দেশগুলোতে জীবনধারণের খরচ প্রাচ্যের চেয়ে বেশি। উন্নত এশীয় দেশ বাদ দিতে হবে অবশ্য। পাশ্চাত্যে মাথাপিছু আয়, তথা শ্রমের মজুরি দুই-ই বেশি। ফলে উৎপাদনের পদ্ধতি যদি একই রকম হয়, তাহলে পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ী দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। মনে রাখবেন, পশ্চিমে মূলধনের সুদ বেশ কম হওয়া সত্ত্বেও খরচ বেশি পড়ে। অন্যদিকে, চীনে যেহেতু সব থেকে সস্তায় শ্রমিক ব্যবহার করা যায় ফলে, সেখানে যে ন্যূনতম মজুরির হার প্রচলিত, তাকে টেক্কা দেওয়া পশ্চিমের উন্নত দেশে এক প্রকার অসম্ভব। উন্নত দেশে যে নতুন করে অন্তর্মুখী আর্থিক নীতির উদ্ভব ঘটছে তার পিছনে প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠার বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। এছাড়া, আমেরিকা-সহ পশ্চিমের অনেক দেশ আপত্তি তোলে যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সকলের জন্যে নিয়মের কড়াকড়ি একই পর্যায়ের নয়। অর্থাৎ, আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু দেশ যতটা আমদানি শুল্ক প্রয়োগ করতে পারে তাদের আমদানির উপরে, উন্নয়নশীল দেশ তার পাঁচগুণ কি দশগুণ শুল্ক আরোপ করে থাকে, কারণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগদান করার সময়ে তারা সেই রকম সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। এর ফলে এক ধরনের অসমতল ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে, যার সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলোতে অনুসৃত ন্যূনতম আর্থিক ক্ষমতায়নের সরাসরি সঙ্ঘাত ঘটে চলেছে। ভারত-মার্কিন নব্য বন্ধুত্বের পশ্চাতে যে চীনকে বিশ্ব-বাণিজ্যের বাজারে ঠেকিয়ে রাখার কোনো কূটনৈতিক প্রয়াস নেই তা কি বলা চলে? এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রচুর টানাপোড়েন।

আমেরিকা প্রায় একতরফাভাবে চীন থেকে আমদানি করা বহু দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করেছে। এ নিয়ে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে গেলেও এ বিষয়টির চটজলদি মীমাংসা হবে, এমন ভাবার কারণ নেই। চীন যে বিশ্ববাজারের উপর ভীষণ নির্ভরশীল, তা অনেকেই জানেন। ফলে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হলে চীনের উৎপাদন, চাকরি এবং আর্থিক বৃদ্ধি বাধা পাবে। স্বল্পমেয়াদে এতে আমেরিকার লাভ। গত বিশ বছরে এই প্রথম আমেরিকাতে বেকারত্ব সবচেয়ে কম, কারণ বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি এবং বৈদেশিক পুঁজিনিবেশ দুটিই কমে যাওয়ার দরুণ আমেরিকার চাকরি অনেকটা আবার আমেরিকাতে ফেরত এসেছে।

ভারতে কিন্তু অবস্থা ঠিক বিপরীত। বহির্বাণিজ্যের প্রসার, বিদেশি পুঁজিনিবেশ, রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রকের চাপে পড়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, ইত্যাদি বহু পদ্ধতি অনুসরণ করেও দেশে বেকারত্ব ৬.৫%। সদ্য কলেজ পাশ-করা যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৫%। এই অবস্থায়, টেক্সাসের মঞ্চে যাঁরা ভারতের রাষ্ট্রনেতার স্বপক্ষে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, তাঁরা এ দেশের নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থসাহায্যও সম্ভবত করে থাকেন, কিন্তু দেশ ও দশের আর্থিক বিকাশের জন্যে কিছু করেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে এই অনভিপ্রেত প্রশ্ন নিয়ে কেইবা মাথা ঘামায়, কারণ আমেরিকাতে ৫০ হাজার ভারতীয় ভোট এবং পার্টির তহবিলে কোটি ডলার চাঁদা জমা পড়লে দেশের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রসঙ্গটি একেবারেই গৌন হয়ে পড়ে।

এর আগেও যে ভারতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আমেরিকা অনাগ্রহী ছিল এমন নয়। রাষ্ট্রপতি ওবামার সময়ে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং 'বিশেষ অর্থপূর্ণ সম্পর্ক' বলে অভিহিত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, ওয়াশিংটনের অবহেলায় সম্পর্কটি আসলে ধামাচাপা পড়ে যায়। অনেকে এই প্রশ্নও তোলেন যে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক বন্ধুত্ব হারিয়ে ফেললে এশিয়াতে বৃহৎ শক্তিধর দেশ হিসেবে চীনের মোকাবিলা করতে আমেরিকা ব্যর্থ হবে। চীনের ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক আগ্রাসন আটকাতে আমেরিকার যে ভারতীয় সাহায্যে প্রয়োজন পড়বে, এ কথা কিছুদিনের জন্যে ভুলেছিল আমেরিকা। ২০১৯-এ এসে দুই দেশের এই নব্য উৎসাহ যে সেই রাজনৈতিক বার্তা যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এমতাবস্থায় ভারতের প্রথম প্রয়োজন অবশ্য ঘর সামলানো। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অসন্তোষ ও অস্থিরতা একটি সুস্থ দেশের ভীত নাড়িয়ে দিতে পারে। ভারতে এখনও সমস্যার শেষ নেই, ৪০% মানুষ এখনও হীন-দরিদ্র, জাত-পাতের কুসংস্কার এখনো দেশকে করে-কুরে খায়। আমেরিকার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে গেলে এই প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে ভারতকে। তবেই সত্যিকারের নতুন সম্পর্ক এবং যুগের সূচনা হবে।

উমা

জাতপাত মুছে দৃষ্টান্ত খাপ পঞ্চায়েত

ভবানীপ্রসাদ সাহু

বিশেষত উত্তর ভারতের নানা রাজ্যের খাপ পঞ্চায়েতের কথা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভিন্ন জাতের বিয়ে করার জন্য ছেলে-মেয়েদের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার বা নানাভাবে হেনস্থা করার ছবি। জাতপাত বর্ণ-ধর্ম নিয়ে অন্ধবিশ্বাস এবং আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য হলেও ঐ অন্ধবিশ্বাস থেকে এই ধরনের নানা বর্বর কাজকর্মের জন্য খাপ পঞ্চায়েতগুলি দেশ জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। এর মধ্যেই একটি ব্যতিক্রমী খাপ পঞ্চায়েতের কথা জানা গেল। হরিয়ানার জিন্দ জেলার নেরা গ্রাম এলাকার অন্তত ২৪টি গ্রামের উপর প্রভাবশালী। সেই গ্রামের মোড়লের পক্ষ থেকে এলাকার সবাইকে নিজেদের নাম থেকে জাতপাতের পরিচয় বহনকারী পদবি বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা অনুসরণও করা হচ্ছে। 'উঁচু জাত'-এর জাঠ সম্প্রদায়েরই হোক বা 'নীচু জাত'-এর নই বা বল্মিকই হোক— সবাই তা করছেনও। পদবির পরিবর্তে নামের সঙ্গে নিজের গ্রামের নাম যোগ করা হচ্ছে। যেমন, নেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অতবির 'পাহেলওয়ান' তাঁর নামের শেষে নিজের গ্রামের নাম 'বরসোলা'-কে 'পদবি' হিসেবে ব্যবহার করছেন। ইনি আগে ছিলেন সামরিক বাহিনীতে। তিনি বলেছেন, 'এসব এলাকায় বিগত শত শত বছর ধরে জাতপাতের উপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ টিকে আছে এবং ক্রমশই তা বেড়ে চলেছে। গ্রামের মানুষের মধ্যেকার সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি জাতপাতের বিচার করার ফলে দাবানলের আকার ধরত।... সামরিক বাহিনীতে জাতপাতের পরিচয়ে কাউকে চিহ্নিত করা হয় না। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেই বা তা থাকবে কেন? গ্রামের নাম ব্যবহার করলে বাইরে গেলে নিজেদের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তাবোধও গড়ে উঠবে।'

বরসোলার মতো হরিয়ানা-সহ ঐ সব এলাকার গ্রামগুলিতে জাতপাতের বিভাজন আর তাকে ঘিরে মিথ্যা ভাবাবেগ এত তীব্র যে, জাঠদের মতো উঁচু জাতেরা তাদের বাড়ির সামনে, গাড়িতে মোটরসাইকেলে নিজেদের 'গোত্র' লিখে রাখে বা খোদাই করে দেয়। জাতপাতভিত্তিক এই আত্মপরিচয় এমনই যে, রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যদি জানা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন জাতের তবে তার কোনো যত্নই করা হয় না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। স্পষ্টতই এসবের ফলে জাতপাতভিত্তিক মারদাঙ্গা ঐসব এলাকায় লেগেই থাকত। এক নতুন ধরনের অস্পৃশ্যতার পরিবেশ যুগ যুগ ধরে টিকে থেকেছে। এই পরিবেশে ভিন্ন জাতে বিয়ে করার বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটি তো অভাবনীয়। তাই পরিবারের শুচিতা তথা সম্মানরক্ষার্থে খুন করা ছিল খাপগুলির নৈতিক-সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই ভয়াবহ পরিবেশে দাঁড়িয়ে নেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই কাজ অভাবনীয়। কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যেই এই অচলায়তন ভাঙার তাগিদ যে সৃষ্টি হয়েছে, তা বোঝা যায়, নেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে, মাজরা ও মৌগাম্মা নামে আরো দুটি খাপও

হরিয়ানার জিন্দ জেলার নেরা গ্রাম এলাকার অন্তত ২৪টি গ্রামের উপর প্রভাবশালী। সেই গ্রামের মোড়লের পক্ষ থেকে এলাকার সবাইকে নিজেদের নাম থেকে জাতপাতের পরিচয় বহনকারী পদবি বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা অনুসরণও করা হচ্ছে।

জাতপাতের পদবি বিসর্জন দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। ২০১৯-এর ২৯ জুন, নেরা খাপের ভোঁসলা গ্রামের অধীন ২৪টি গ্রামের ১৬ জন প্রতিনিধির সবাই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রতি গ্রামে ৫ থেকে ১০ জনের এক-একটি দল গড়া হয়েছিল, যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই পদক্ষেপের সুফল ও ইতিবাচক দিকগুলি প্রচার করেছেন। তাঁরা এটি স্বীকার করেন যে, এত শত বছর এই নিগড় রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা মুশকিল। তবু কোথাও ছোট্ট করে শুরু না করলে তো ভালো কাজ করা যাবে না। সরকারি নথিপত্রে এই মুহূর্তে পদবি লোপ করা মুশকিল। কিন্তু বাড়িতে, গাড়িতে যেভাবে দাগানো হত, তা বন্ধ হয়েছে। উদয়বীর নেহরা, যাঁর এখন নতুন নাম উদয়বীর বরসোলা, যেমন বলেছেন, 'আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো রকারিভাবে তাদের নাম থেকে পদবি বিসর্জন দিতে পারবে।'

শুধু জাতপাতের বিরুদ্ধে নয়, মোবাইল ব্যবহার না করা, জিনস

না পরার মতো যে সব বিধিনিষেধ মেয়েদের উপর চাপানো ছিল, তাও এঁরা তুলে দিয়েছেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, সামাজিকভাবে মেয়েদের উত্তরণ ঘটানো। এ কাজটা এঁরা শুরু করেছিলেন আগেই। তার প্রতিফলন ঘটেছে কন্যাসন্তান জন্মানোর হার বাড়ার মধ্যেও। জাতপাত বা ঐ ধরনের পুরুষতান্ত্রিক তীব্র মানসিকতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ছিল, পরিবারে কন্যাসন্তানকে অবাঞ্ছিত ভাবা এবং তার জন্য কন্যাভ্রূণ হত্যার মধ্যে। এর ফলে, ২০১৫ সালে বরসোলা গ্রামে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১০০০ পুরুষপিছু মাত্র ৫২৫। কিন্তু খাপ পঞ্চায়েতের লাগাতার প্রচার ও প্রচেষ্টার ফলে ২০১৮–তে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০০-তে। এছাড়া সুস্থ পরিবেশের স্বার্থে এঁরা বিয়েবাড়ি বা অন্য অনুষ্ঠানে উৎকট বিকট শব্দের 'ডিজে' বাজানো বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি শুধু শব্দদূষণ কমানোর উদ্দেশ্যে নয়, এর ফলে ডিজে-র বাজনার সঙ্গে মত্তদের বীভৎস নাচের মতো নোংরামিও বন্ধ হয়েছে, একসময় এই নাচের সঙ্গে বেলাগাম বন্দুক ছোঁড়াও ছিল ঐ সব অঞ্চলের 'কালচার'।

আপাতভাবে অস্বাভাবিক মনে হলেও, গ্রামগুলির মহিলারা এই সব সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন, পুরুষদের মধ্যে তবু কিছু সন্দেহবাদী রয়েছে। এই সব মহিলারা তাঁদের পদবি বাদ দিয়ে একটি নামই নথিপত্রে ব্যবহার করছেন। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, পুরো অঞ্চলেই জাতপাত নিয়ে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বরসোলার এক জাঠ কৃষকের কথায় এর প্রতিফলন ঘটে। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'পদবি ব্যবহার না করে কী লাভ হবে? আমরা নীচু জাতির মধ্যে বিয়ে দেব?

এই সব নির্দেশ যারা দিয়েছেন, তাঁরাও কি তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিজের জাতের বাইরে বিয়ে দেবেন? এটি একটি প্রতীকী পদক্ষেপ। অবশ্যই জাতপাত নিয়ে কোনো ভেদাভেদ বা ঘৃণা থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি ভাবা হয় যে, শুধু পদবি বাদ দিলেই জাতপাতের এই মানসিকতা নির্মূল হয়ে যাবে, তবে সেটি হবে একটি ভাল চিন্তা মাত্র। কিন্তু পুরো পরিবর্তনের জন্য কয়েকশো বছর লাগবে। তবে এখন আমরা জানি না, আমাদের ধাবায় কে রান্না করেন, কোনো নীচু জাতের কেউ হতেই পারেন। পরিবর্তন কিন্তু ঘটেছে, আমরা আর আগের মত কঠোর থাকছি না।' তবু এই শুরুটাও এতদিন হচ্ছিল না, নেরা খাপ পঞ্চায়েতও এই ধরনের কাজ শুরু করেছেন, হৈবাতপুরের প্রধান মাহেন্দার সিং রাঠাল তাই মন্তব্য করেছেন, 'জাতপাত হরিয়ানাকে রোগগ্রস্ত করে তুলেছে, যেমন বাকি দেশকে রক্তাক্ত করছে সাম্প্রদায়িকতা। নেরা নাম–এর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেই হয়, আমরাও তার অনুমোদন দিয়েছি। মাজরা খাপের অধীনে ১৪টি গ্রাম আছে এবং বিভিন্ন জাতের ১১১ জন প্রতিনিধির সবাই এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন। আমরাও ছোট ছোট দল গড়েছি, যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাতপাতভিত্তিক পরিচয়ের এই পশ্চাদমুখী মানসিকতাকে দূর করার জন্য প্রচার করবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে এখন 'রাঠাল' নামে ডাকবেন না। আমার নাম এখন মাহেন্দার সিং হৈবাতপুর।'

বর্তমানে এ দেশে ধর্মীয় মেরুকরণ, জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের নামে হিংস্র কাজকর্ম, নাগরিকত্বের নামে ধর্মীয় বিভাজন ও বিদ্বেষ ইত্যাদি যখন তীব্রভাবে বাড়ছে ও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে, তখন হরিয়ানার ঐ পরিবেশে নেরা–মাজরা–মৌগাম্মা–র মতো খাপ পঞ্চায়েতের এইটুকু ইতিবাচক অগ্রগমনও মনে আশা জাগায়। অন্ধবিশ্বাসী মানুষের মিথ্যা ভাবাবেগকে দূর করে মানবিক সুস্থ সুন্দর মুক্তমনা মানুষের দেশ গড়ে তোলা নয়, ঐ অন্ধত্ব ও ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে, বাড়িয়ে তুলে ও ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করে হিটলারের এই উত্তরসূরি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় এসেছে। দেশের সাধারণ মানুষের খাদ্য–বস্ত্র–শিক্ষা–বাসস্থান–চিকিৎসার দৈনন্দিন সব সমস্যার যেন সমাধান হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় তথা অন্ধ সাম্প্রদায়িক 'পবিত্র' স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার কাজ। এই অবস্থায় এই ধরনের ছোট ছোট কাজেরও সামগ্রিক অভিঘাত বিপুল হতে পারে।

(সূত্র: মুম্বাই মিরর, ২১ জুলাই ২০১৯, শ্বেতা দত্তের প্রতিবেদন)

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার **ফোন নম্বর**: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ -১২৬৩৭।

দেদার নম্বর তো দিচ্ছি, পড়ুয়ারা শিখছে তো!

নন্দগোপাল পাত্র

২০১৯ সালে উচ্চমাধ্যমিকের যে ফলাফল প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় শতকরা একশো ভাগ নম্বর পেয়ে কেউ প্রথম হয়েছে! একজনের ক্ষেত্রে হলে একে যদি আশ্চর্য বলেন, তাহলে অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল— একাধিক জন ওই নম্বর পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু ছাত্রছাত্রী একাধিক বিষয়েই প্রায় পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। যেমন, এবারের উচ্চমাধ্যমিকে ৫০০-য় ৪৯৮ নম্বর পেয়েছে দুজন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ইতিহাসে প্রথমবার যৌথভাবে প্রথম হওয়ার ঘটনা ঘটল। ছজন দ্বিতীয় হয়েছে। প্রথম দশজনের মেধাতালিকায় মাত্র ১৩ নম্বরের ফারাকে জায়গা করে নিয়েছে ১৩৭ জন। এ-ও সর্বকালীন রেকর্ড। গতবার প্রথম দশে ছিল ৮০ জন। পাঠ্যক্রম ও প্রশ্নপত্রের ধাঁচ বদলের ফলে কলা ও বাণিজ্যের মতো বিনা-ল্যাবরেটরির বিষয়েও তাকলাগানো সাফল্য উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের। এবারের মেধাতালিকায় সবচেয়ে নজরকাড়া দিক হল— 'ও' গ্রেড (৯০-১০০ নম্বর) পেয়েছে ৭,৮১৮ জন। যা গত বছরের তুলনায় আড়াই হাজারেরও বেশি। একইভাবে 'এ+' (৮০-৮৯) এবং 'এ' (৭০-৭৯) গ্রেড পাওয়া পড়ুয়াও গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সাম্প্রতিক অতীতের ফলাফলে যা বেনজির। ২০১৮ সালের সিবিএসই পরীক্ষায় সারা দেশে প্রথম ছাত্রী ৫০০-র মধ্যে ৪৯৯ নম্বর পেয়েছিল! অর্থাৎ, ৯৯.৯৯ শতাংশ! আইএসসিতে চলতি বছর সাতজন একই নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। যারা ৯৯.৫০ শতাংশ পেয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ইতিহাসে প্রথমবার যৌথভাবে প্রথম হওয়ার ঘটনা ঘটল। ছজন দ্বিতীয় হয়েছে। প্রথম দশজনের মেধাতালিকায় মাত্র ১৩ নম্বরের ফারাকে জায়গা করে নিয়েছে ১৩৭ জন। এ-ও সর্বকালীন রেকর্ড।

ইদানীং কোনো পড়ুয়া ৯৬% পেয়ে কপাল চাপড়াচ্ছে, আবার কেউ ৯৪% পেয়ে হতাশায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। একসময় ছিল ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই ছাত্রছাত্রীকে বাহবা দেওয়া হত, আর ৭৫% অর্থাৎ স্টার মার্কস পেলে, তাকে সত্যি সত্যিই তারকার মতো মর্যাদা দেওয়া হত। পাড়ার লোক একডাকে সেই বাড়ি চিনত। গর্ব করে অন্যকে দেখাত, ওই বাড়ির ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। তখনকার বাবা-মায়েরাও বেশি করে বকাঝকা করত, মারত আর বলত 'ওরে পড়তে বোস, ফার্স্ট ডিভিশন না পেলে পাড়ায় যে মুখ দেখাতে পারব না। বাবার এত পয়সা নেই যে বেসরকারি কলেজে ভর্তি করাবে।' এখন কেউ ৮০% পেলে তা ছাত্রছাত্রী তো বটে তাদের অভিভাবকদেরও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। যে ছাত্রছাত্রীরা নিষ্ঠা মনোযোগ শ্রম মেধা দ্বারা খুব ভাল ফল করছে, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হচ্ছে, তারা অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় দশম মানের পর ১০+২ স্তরের সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা নেওয়া ও ফলাফল প্রকাশের সুবিধার্থে ১৯৭৫-এ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ গঠিত হয়। ১৯৭৮ থেকে শুরু করে ২০০৬ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ে মোট ১০০০ নম্বরের সঙ্গে অতিরিক্ত একটি বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হত। ১৯৮২ পর্যন্ত ২অতিরিক্ত

বিষয়ের নম্বর যোগ হত না। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৭ অতিরিক্ত বিষয়ে ৮০-এর বেশি পেলে তা এগ্রিগেটের সঙ্গে যোগ হত। ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ অতিরিক্ত বিষয়ে ৮০ নম্বর কমে দাঁড়াল ৬০-এ। ২০০৭ থেকে ২০১০ এগ্রিগেটের বদলে আসে গ্রেড, আর অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর যোগও হল না। এর পরেই দুটি ভাষা ও তিনটি ইলেকটিভ বিষয় নিয়ে এগ্রিগেট। এরই মধ্যে ১০০০ নম্বরের বদলে এসে গেছে ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা এবং তা কেবলমাত্র দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচির। ২০১৫ থেকে ল্যাব-নির্ভর বিষয়ে প্র্যাকটিক্যালের পাশাপাশি নন-ল্যাব সব বিষয়েও প্রজেক্ট ওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ১৯৭৮ থেকে এখনও পর্যন্ত ছটি বিষয় পড়তে হয়। কিন্তু পরীক্ষার নম্বরে এই বিস্ফোরণ দেখে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে: তবে কি সত্যই শিক্ষাব্যবস্থার ভোল পাল্টে গেছে? না, শিক্ষাব্যবস্থা বদলায়নি, বদলেছে

প্রশ্নপত্রের ধরন ও মূল্যায়নের নীতি। আগে মূলত সর্বভারতীয় বোর্ডের পড়ুয়ারাই বেশি নম্বর পেত। এক সময় কম নম্বর নিয়ে রাজ্য বোর্ডের পড়ুয়ারা উচ্চশিক্ষা বা অন্যান্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় বোর্ডের পড়ুয়াদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। কারণ

ছিল, বোর্ড ও সংসদের পরীক্ষায় শতাংশের নিরিখে কম নম্বর। নম্বর তোলার দৌড়টা শুরু করেছিল সর্বভারতীয় সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ড। পরে রাজ্য বোর্ডে দাবি ওঠে মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কারের। এও ঠিক, একটি প্রচলিত ব্যবস্থা আবহমানকাল ধরে চলতে পারে না। এখন উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কেবলমাত্র সর্বশেষ বছরের সিলেবাসের উপর চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর ফলে পরীক্ষায় বেশি বেশি নম্বর পাচ্ছে রাজ্য বোর্ডের পড়ুয়ারা। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হয় 'অবজেক্টিভ', অর্থাৎ কেবল দু-এক কথায় সংক্ষিপ্ত

উত্তরটি দিতে পারলেই পুরো নম্বর। যেমন পদার্থবিদ্যার ৭০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। এতে এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন) ১৪ নম্বর, অতি সংক্ষিপ্ত ৪ নম্বর, সংক্ষিপ্ত ১০ নম্বর, বাকি ৩ ও ৫ নম্বরের প্রশ্নগুলোতেও নম্বর বিভাজন ২, ১ বা ৩, ২। ভূগোলে আবার এম সি কিউ ১৪ হলেও অতি সংক্ষিপ্ত ২১ নম্বরের। দেখা যাচ্ছে প্রশ্নপত্রে অবজেক্টিভ প্রশ্নের উপর বাড়তি গুরুত্ব পড়ুয়াদের বেশি নম্বর পেতে সাহায্য করছে। এই ব্যবস্থা কি পড়ুয়াদের চিন্তানির্ভর দক্ষতাকে কমিয়ে দিচ্ছে? এর ফলে পড়ুয়ারা কি মুখস্থবিদ্যা নির্ভর হয়ে পড়ছে? এ তো ঠিক পড়ুয়াদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য স্বচিন্তার বিকাশ খুবই জরুরি। তবেই পড়ুয়ারা পাঁচটা বই ঘেঁটে, ইন্টারনেট খুঁজে উত্তর লিখে কেউ পরিপূর্ণতার স্বাদ পাবে। শিক্ষার বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারে। সেই অভ্যাসটা কিন্তু তৈরি হওয়া দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পড়ুয়াদের বড় অংশেরই এখন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়া বা রেফারেন্স বই ঘেঁটে দেখার অভ্যাস নেই বললেই চলে। এখন বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় মাউসে ক্লিক করে বা স্মার্টফোনে আঙুল ছোঁয়ালেই বই পড়া সম্ভব। অধিকাংশ পড়ুয়াও এটাই চায়। অনলাইন ব্যবস্থা এখন সমাজের মজ্জাগত। এতে শহরাঞ্চলের কিছু সংখ্যক পড়ুয়া এগুতে পারে ঠিকই, গ্রামাঞ্চলের পড়ুয়ারা বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়। নিবন্ধের শুরুতেই নম্বরের পরিসংখ্যান ছিল। এবার চোখ ফেরানো যাক বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের দিকে। গণিতে না হয় ১০০ শতাংশ বা ৯৯ শতাংশ নম্বর উঠতে পারে। কিন্তু বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে পড়ুয়ারা কী করে ফুল মার্কস পাচ্ছে? এটাই ভাবাচ্ছে শিক্ষামহলকে। এই ভাবনাকে উস্কে দিলেন ক'দিন আগে আমার পরিচিত ডাক্তারবাবু সুকুমার বারিক। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'দুর্গাপুজো' সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করে থাকেন এবং উত্তরে যদি পাঁচটি কথা লিখলে পুরো মার্কস পাওয়া যায়, তাহলে সে ফুল মার্কস পাবে। এই পাঁচটি কথা হয়তো — শরৎকাল, নীল আকাশ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, কাশফুল ও শিউলিফুল। আমি যেভাবেই লিখি না কেন, এই পাঁচটি কথা আছে, সুতরাং ফুল মার্কস! এছাড়া নম্বর বাড়ার আরও একটি কারণ হল ২০১৫-য় সব বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রজেক্ট ওয়ার্ক। তা পড়ুয়াদের বাড়তি নম্বর পাইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে পড়ুয়াদের 'মাইক্রো' গবেষক গড়ে তোলার লক্ষ্য অধরা থেকে গেল। বাজারচলতি নোট বই থেকে টুকে প্রজেক্ট ওয়ার্ক সারে পড়ুয়ারা। এতে যে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রজেক্টে ভালো কাজ করল, আর যে করল না, তাদের একই নম্বর দিলে অবিচারও করা হল। এটা তো ঠিক বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল স্কুলশিক্ষার মানের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু, দেশের বাস্তব চিত্রটা অন্য রকম। 'প্রথম' নামে দেশের এক নামী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের ১৪-১৮ বছর বয়সী পড়ুয়াদের ২৫% সাধারণ পাঠ্যসূচি পড়তে অক্ষম। এমনকি ওই বয়সী পড়ুয়া, যারা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় বসবে, তাদের ৪৮% ঐকিক নিয়মে একটা সহজ অঙ্ক সঠিকভাবে শেষ করতে পারে না। অথচ সিবিএসই অথবা রাজ্য বোর্ডগুলির পাসের হার ৮৫% ছাড়িয়ে গেছে এবং উত্তরোত্তর সে হার বেড়েই চলেছে। এটাই বিস্ময়ের পাশাপাশি উদ্বেগেরও। শিক্ষা কি শুধু অক্ষরপরিচয়? শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত লক্ষ্য নম্বর পাওয়া নয়। প্রকৃত লক্ষ্য হল এমন জ্ঞান অর্জন করা যা সারা জীবন ধরে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আসলে জীবনের সব কিছুতে, চাকরিতে, আমরা পরীক্ষার মার্কশিটকেই একমাত্র পাসপোর্ট হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছি বা নিজেরাও শিখেছি, তাতেই বোধহয় বেশি গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আড়াই দশকের বেশি সময় স্কুলশিক্ষায় যুক্ত থাকার সুবাদে আমার মনে হচ্ছে, আরও একবার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রের ধরন ও মূল্যায়নের নীতি বদলের প্রয়োজন। অতীত ও বর্তমান সব যুগেই মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হল পড়ুয়ারা কতটুকু শিখল। কিন্তু ৮০ শতাংশ নম্বর পাওয়া পড়ুয়া যখন একটা অনুচ্ছেদ লিখতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে, তখন আমাদের ভাবতে হবে মূল্যায়নে কোথাও গলদ থেকে যায়নি তো! পড়ুয়াদের বিচার ও বিশ্লেষণ কি ঠিকমতো যাচাই হল না! তাদের জানা তথ্য ও জ্ঞানের মিল কি বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা করতে সক্ষম হল না? সব দিক ভেবে মনে হয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ার নিবিড় সমীক্ষণ প্রয়োজন।

(মতামত ব্যক্তিগত)

বইমেলায় উৎস মানুষ-এর নতুন বই

স্বাস্থ্যের সাতকাহন

ডাঃ গৌতম মিস্ত্রী

এই সময়ে না-ধার্মিকদের একজোট হওয়া জরুরি

গত ৮ই ডিসেম্বর গোবরডাঙার গৌরী লঙ্কেশ সভাগৃহে (দ্বীপান্বিতা অনুষ্ঠানগৃহ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য না-ধার্মিক মানব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উদ্যোক্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল 'না-ধার্মিক, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ'-র কথা এবং বলা হয়েছিল 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক-মানবিক জীবনভাবনার লক্ষ্যে' আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য— কর্মসূচি প্রণয়ন'।

এর আগে ২০০২ সালে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে দু দিন ধরে নাস্তিক-নিরীশ্বরবাদী সম্মেলন হয়েছিল। তারও আগে ১৯৯০-এ মধ্যমগ্রামে হয়েছিল বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে নাস্তিক সমাবেশ। এতে উৎস মানুষ পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। ২৯ এপ্রিল, ১৯৯০ কলকাতায় শিয়ালদহের কাছে নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট জিমনেসিয়ামে (ক্লেম ব্রাউন মঞ্চ) উৎস মানুষ-এর যে আড্ডা হয়েছিল, তারও বিষয় ছিল 'না-ধার্মিক'-এর জীবনযাত্রা।

এইভাবেই মাঝেমাঝে সমমনস্ক মানুষদের নিয়ে এই ধরনের সমাবেশ-সম্মেলন হয়েছে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে। বহুদিন পরে এসবেরই ধারাবাহিকতায় প্রায় ১৬০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৮ই ডিসেম্বরের এই সমাবেশ নতুন এক দিশার সন্ধান দেবে এটাই প্রত্যাশিত। আসাম ও বাংলাদেশের কয়েকজন প্রতিনিধিও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নানা সংগঠনের বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে সঙ্ঘ পরিবারের নেতৃত্বে হিন্দু মৌলবাদী তথা হিন্দুত্ববাদীরা স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা হিটলারীয় জমানার হাড় হিম করা দিনগুলিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৮ ডিসেম্বরের সম্মেলনের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। খসড়া প্রতিবেদনেও 'সঙ্ঘ পরিবারের অ্যাজেন্ডা হিসেবে রাষ্ট্রীয় মদতে' চলা গণবর্বরতার উল্লেখ করা হয়েছে। স্মরণ করা হয়েছে ১৯৭০-এর পরবর্তী সময়কালে নতুনভাবে রাজ্যে যে 'বিজ্ঞান আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলন, বিজ্ঞানমনস্ক জীবনচর্যা গড়ে তোলার এক নতুন সমাজভাবনা' শুরু হয়েছিল ঐ ইতিহাসকে।

আগেকার প্রায় এই ধরনের সমাবেশ বা সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এবং মূল কাজের ধারাবাহিকতা থাকলেও, পরবর্তীকালে এ ধরনের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চকে স্থায়ী রূপ দেওয়া যায় নি। এবারের সম্মেলনে এই স্থায়িত্ব দেওয়ার কাজটি করারই প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার নেওয়া হল। সম্মেলনে ১০টি আলোচ্যসূচি ছিল। প্রথমটি ছিল 'ধর্মের নামে নাগরিক জীবনের সুস্থতা, সামাজিকতা, নাগরিকত্ব খারিজ ইত্যাদি অমানবিক কর্মসূচি নেওয়া যাবে না।' আটটি 'প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ' রাখা হয়েছিল। যার প্রথমটি 'ধর্মমুক্ত সংস্কৃতির লক্ষ্যে ধর্মীয় উৎসবের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানবিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা'। ছিল সহায়ক নানা কর্মসূচির প্রস্তাব। এই খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে সারাদিন ধরে বিভিন্ন কর্মী-বক্তা তাঁদের মতামত জানান। এসব নিয়ে কর্মসূচির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে। 'ত্রৈমাসিক মুক্তমন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমাদের চারপাশে ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধর্মবিশ্বাসী মানুষজন এখনও সংখ্যাগুরু। এঁরাও বহু দলে-উপদলে বিভক্ত। তবু জনমানসে ও সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়স্তরেও এঁদের প্রভাব বিপুল। যার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ধর্মীয় মৌলবাদীদের (ভারতে এখন যেমন হিন্দুত্ববাদীদের) উত্থান সম্ভব হয়। সে তুলনায়, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী, নাস্তিক, অনীশ বা না-ধার্মিক, ধর্মপরিচয়মুক্ত ব্যক্তিরা সংখ্যালঘু। এই সংখালঘুত্বের দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায় তাঁদের অনৈকের কারণে। সম্মেলনে এক বক্তার মন্তব্য ছিল— 'মুখোশ, দ্বিচারিতা আর ইগো' এসব কাটিয়ে উঠে না-ধার্মিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আশু প্রয়োজন।

গোবরডাঙার না-ধার্মিক সম্মেলনটি এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আশা জাগায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমমনস্ক ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো নিজ নিজ স্তরে কাজ করবেন, এটাই প্রত্যাশিত এবং সমাজে তারও প্রভাব অনেক পড়ে। কিন্তু ধর্মীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে প্রয়োজন আরও শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, ধারাবাহিক কাজ। গোবরডাঙার ৮ই ডিসেম্বরের না-ধার্মিক সম্মেলন এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার কাজটি যথাসম্ভব প্রথম শুরু করল এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডই তা প্রমাণ করবে। আপাতত আমরা আশা করব, আমাদের সবার মানসিক ও শারীরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরব্ধ কাজটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রতিবেদক **ভবানীপ্রসাদ সাহু**

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবর্ষ স্মরণে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০–১৮৯১) জন্মের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং আমাদের কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে যৌথ উদ্যোগে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মসূচিতে ফতেপুর হাইস্কুল, আনন্দপুর হাইস্কুল, রাজবেড়ে সতীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, বিরহী নেতাজি বিদ্যাভবন, উত্তর রাজাপুর নজরুল স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, উত্তর রাজাপুর জি এস এফ পি স্কুল, মুড়াগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিজরা রায়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাতিকান্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাটাবেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়, রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষ কমিটি, হরিণঘাটা, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, হরিণঘাটা, নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতি, বারাজাগুলি গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতি ও বামনপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল ইত্যাদি স্কুলও অংশ নেয়। ২৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় পদযাত্রার মাধ্যমে সূচনা হয় কোটনিস কমিটি, বড়জাগুলির কালিবাজার প্রাঙ্গণ থেকে। প্রায় এক কিলোমিটার পথপরিক্রমা শেষ হয় বড়জাগুলি বেসিক ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণে। প্রায় ২৫০ লোকের পদযাত্রা দেখে সকলে উচ্ছ্বসিত। বিকেল ৫টায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অতিথি বক্তা অধ্যাপক ড. অশোক নন্দা বিস্তারিতভাবে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শ্রোতাদের মনে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ তৈরি করে।

পরিশেষে জানাই, দ্বিশত বৎসরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে হবে। তার আগে সারা বছর বিদ্যাসাগরের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের সকলের কাছে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

নিরঞ্জন বিশ্বাস
বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
বড়জাগুলি

বাঙালির গর্ব

মুম্বাইয়ে অতিথিসেবায় এক বাঙালি পরিবার। ঘুরতেই হোক বা ব্যবসা কিংবা ক্যান্সার চিকিৎসা— মুম্বাইয়ে এলে দাদারে আপনাকে বাঙালি আতিথ্যে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সম্পূর্ণ বাঙালি প্রতিষ্ঠান ‘বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশন’। সস্তায় দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভাড়ায় এসি, নন–এসি সাজানো ফ্ল্যাট, রুম ও ডর্মেটরি পাওয়া যায়। খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। নিজেরাও রান্না করে খেতে পারেন।

যোগাযোগ: **বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশন**
প্রতিষ্ঠাতা: শংকরনাথ খাঁড়া ও চরম সুখী পরিবার। দাদার, মুম্বাই।
দূরভাষ: 9088105212/ 9875332977

WBCS অফিসারের জীবন কথা

দুই খণ্ডে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ History of English Press in Bengal 1780 -1857 এবং 1858-1881–র লেখক ড. মৃণালকান্তি চন্দের ২০২০–র কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে নতুন বই ‘WBCS অফিসারের জীবন কথা’। প্রকাশক: বই–চিত্র (কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসের তিনতলা), মূল্য ১২৫ টাকা। প্রাপ্তিস্থান: উৎস মানুষ, স্টল নং ৪৭৯।

নতুন সামাজিক অসুখ ডিজে

[হুগলিতে ডিজে বক্সের শব্দতাণ্ডবের বিরুদ্ধে মানুষকে নিয়ে আন্দোলন, ডিজে–ব্যবসায়ীরা পিছু হটল অবশেষে]

রামমোহন–বিদ্যাসাগর (হুগলিতে জন্ম), অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাধানাথ শিকদার (চন্দননগরে থাকতেন) — খ্যাত হুগলিতে গত ১০ বছর ধরে একটি বিশেষ রাজনীতির লোকেরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে ৫–৬টি ডিজে. ইউনিট নিয়ে তারস্বরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করত এবং করে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের অনুমতি নিয়ে, পুলিশের ব্যারিকেড নিয়ে। একটা নতুন সংস্কৃতিকে হুগলির জনমনে অতি কৌশলে চাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ আমরা দেখি ও দেখতাম। বিশেষ করে সংস্কৃতিপ্রবণ – বামপন্থী চন্দননগরে সেই রাজনৈতিক দল কয়েকজন হোল টাইমার বা বিস্তারকের মাধ্যমে চন্দননগর শহরের মাঠে। এপ্রিলের কোনও

একদিন প্রায় ১০,০০০ মানুষের হিন্দুত্ববাদী মিছিল করে, এখানে ১০/১২টি ডিজে ইউনিট ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রেও পুলিশের অনুমতি থাকে। আমাদের মনে হয়েছে যে গত ১০ বছর ধরে এই মিছিল গ্রামে-শহরে ডিজের তাণ্ডবকে আরও বাড়াতে 'অনুঘটকের' কাজ করেছে। যে কোনও পুজো বা ইদের খুশির অনুষ্ঠানে কোনও পুলিশের অনুমতি ছাড়াই তারস্বরে ডিজে হুগলির নানা জায়গায় বাজানো হত। আমরা দেখেছি যে একদিনে পুরো ডিজে ইউনিটের ভাড়া ৫০০০–৮০০০ টাকা। কোনো গঠনমূলক কাজে টাকার অভাব হলেও, এসব ক্ষেত্রে ঠিক টাকা উঠে যেত বা যায়। গত ১০ বছর ধরে হুগলি জেলার প্রায় সকল অঞ্চলই ডি. জে.-র শব্দতাণ্ডবে ব্যতিব্যস্ত। বিভিন্ন এলাকার প্রবীণেরা প্রচণ্ড অখুশি, কিন্তু তাঁরা নিরুপায়।

হুগলির বিশিষ্ট ইএনটি চিকিৎসক ডাঃ বি কে রায় ডিজে বক্স ও এয়ার হর্নের ব্যাপারে প্রচণ্ড অখুশি, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয় না দেখে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ। চন্দননগরের ডাঃ অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ডাঃ শ্যামলী ঘোষ, ডাঃ চন্দন ঘোষাল–সহ অনেক চিকিৎসকই ডিজের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ২০১৭–১৮য় হুগলির কিছু ক্লাব এলাকায় ডিজের ব্যাপারে প্রচুর পোস্টারিং করেছিল। চুঁচুড়া পুরসভার বর্তমান প্রধান মৌখিকভাবে ডিজে বক্স নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেন। কৌতূহলীর পক্ষ থেকে ২০১৮–র জুন মাসে তখনকার পরিবেশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন— 'আইনগতভাবে ডিজে বক্স সারা বাংলায় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করব।' কিন্তু তিনি ওই পদ থেকে সরে যান, ফলে সেই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা (কৌতূহলীর সদস্যরা) গত মার্চ-এপ্রিল ('১৯) থেকে ধাপে ধাপে কাজ শুরু করলাম, প্রথমে বারবার সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে গণ-স্বাক্ষর করালাম, তারপর পোস্টারিং-হ্যান্ডবিলিং করা হয়েছিল, আমরা এই বিষয়টিতে খুব বেশি নিবদ্ধ করেছিলাম।

চুঁচুড়া স্টেশন ও হুগলি কোর্টের ধারে আমাদের তিনজনের নামে পোস্টার মারা হয়েছিল যে ২ অক্টোবরের মধ্যে হুগলি জেলা পুলিশ ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ডি. জে. বক্স নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলে আমরা তিনজন (রানেশ্বর প্রসাদ, রবি সামন্ত ও প্রদীপকুমার দত্ত) চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে 'আত্মাহুতি' দেব। এই পোস্টার প্রকাশের পর ২২ সেপ্টেম্বর-এ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আমাদের ডেকে পাঠানো হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর-এ আমরা এ. সি. পি (হেড কোয়ার্টার) সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও ৪/৫ জন আধিকারিকের সাথে ডি. জে. বক্সের ব্যাপারে বিস্তৃত সভা করি। ওই দিনই সিদ্ধান্ত হয় যে হুগলির নানা জায়গার মানুষদের শব্দদূষণের ব্যাপারে

সচেতন করা হবে, সেই অনুযায়ী ২ অক্টোবর বেলায় ঘড়ির মোড়ে কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা, বিবর্তন বিজ্ঞান সংস্থা (চন্দননগর), হুগলি নাগিরক মঞ্চ ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের যৌথ সভা অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়েছিল। সভায় ডাঃ বই কে রায়, শিক্ষক সব্যসাচী রায়চৌধুরী, আইনজীবী কমলাকান্ত দাশগুপ্ত, গল্পকার মানস সরকার, সাংবাদিক সৌমিত্র দেব সরকার, বিজ্ঞানকর্মী প্রশান্ত দাসরা শব্দতাণ্ডবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ডি. সি. পি. (ট্র্যাফিক) হরেকৃষ্ণ হালদার ডি. জে.-র ব্যাপারে পুলিশের বক্তব্য পরিষ্কার করেন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট

পরিষ্কারভাবে জানান – 'কোনওভাবে কোনও অনুষ্ঠানে ডি. জে. বক্স ব্যবহার করা যাবে না।' এই সভা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগায়। কৌতূহলীর পক্ষ থেকে ডি. জে.-র ব্যাপারে অভিযোগ জানানোর জন্য পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই ব্যতিক্রমী সভা মানুষের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগায়, চুঁচুড়া থানা সহ অনেক থানা থেকে মাইক ব্যবসায়ীদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে পরিষ্কার জানানো হয় – কোনওভাবেই ডি. জে. বক্স কোনও অনুষ্ঠানে ভাড়া তারা দিতে পারবে না।' আমরা দেখলাম যে হুগলি-চুঁচুড়া-চন্দননগরে দুর্গাপুজোয় (প্রায় ৪০০টি) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডি. জে. বাজে নি, উল্টে খুব আস্তে করে বাংলা গান বেজেছে

মানুষের অসুবিধা না করে। দু'একটি ক্ষেত্রে ডি. যে.-র ব্যাপারে

অভিযোগ পুলিশের কাছে গিয়েছিল। তাতেও কাজ হয়েছে। ২০১৯-এ দুর্গাপুজো থেকে ছটপুজোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডি. জে. না বাজিয়ে অন্য মাইক বা তাসা বাজানো হয়েছে। অথচ ছটপুজোয় ২০১৮-তে বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে তারস্বরে ডি. জে. বেজেছিল। কালীপুজোর আগে চুঁচুড়ায় জনগণ-পুলিশকে নিয়ে একটি শব্দদূষণ বিরোধী পদযাত্রা মানুষের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। গত দু'মাসে ১৬টি শব্দদূষণ বিরোধী সভা আমরা চুঁচুড়া-হুগলি- চন্দননগরে করেছি। আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি পুলিশের সহযোগিতায়। এখানকার প্রবীণ থেকে তরুণরা প্রত্যেকেই এবার ডি. জে.-র উৎপাত থেকে পেয়েছেন। সেই সাথে ডি. জে.-র মাধ্যমে যে একটা অশালীন সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়েছে। এতকিছুর পরও আমাদের সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ-জনগণকে নিয়ে সামনে বিয়ে ও পিকনিক মরশুমে আমাদের ডি. জে. বিরোধী সভা চলবে। সেইসাথে আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই শব্দতাণ্ডবের ব্যাপারে আমরা জানাতে চলেছি। ছাত্রছাত্রীদের সুচেতনাই তো ভরসা।

প্রতিবেদন

কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা

চিঠিপত্র

সিঙ্গুরের শ্মশানভূমি কি বেশি পছন্দ?

গত সংখ্যার (অক্টো-ডিসেম্বর ২০১৯) সম্পাদকীয়তে অত্যন্ত সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে 'উৎস মানুষে'র স্বভাবসিদ্ধ সুচিন্তিত মন্তব্য করা হয়েছে। বিষয়গুলোর একটি বায়ুদূষণ। সেই অজুহাতে সম্পাদক মশাই টেনে এনেছেন সিঙ্গুরে টাটার সস্তা মোটর গাড়ি তৈরির চেষ্টার কথা। উপলক্ষ: কমরেডরা পথসভায় সিঙ্গুর নিয়ে আক্ষেপ করেছে। তিনি সানন্দে জানিয়েছেন সানন্দায় গাড়ি কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে টাটারা সুবিধে করতে পারে নি, সেখানে গাড়ি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা (প্রতিযোগী গাড়ি প্রস্তুতকারীদের মদতে?) বছরখানেক আটকে দেওয়াতে সস্তার গাড়ি তৈরির অন্য প্রতিযোগীদের সুবিধে হয়েছিল। এই টালবাহানায় মূলধনের যে ক্ষতি হল তাতে টাটার সেই গাড়ির মূল আকর্ষণ, সস্তা, তা আর রইল না, গাড়ি তৈরির খরচ বেড়ে গেল। সম্পাদকমশাইয়ের ভবিষ্যৎ দর্শন: সিঙ্গুরের গাড়ি উৎপাদন বন্ধ হয়ে "কারখানার জায়গায় বহুতল আবাসন হত প্রবাসীদের জন্য।" তার থেকে সিঙ্গুরের শ্মশানভূমি কি সম্পাদকমশাইয়ের বেশি পছন্দ? তিনি নিশ্চয়ই খুশি শালবনিতে ইস্পাত কারখানা না হয়ে ফল চাষ হচ্ছে!

তাঁর ধারণা মনে হয় সিঙ্গুরের গাড়ি তৈরি হত পশ্চিমবাংলার জন্যই, সেখানে 'বাড়ি বাড়ি গাড়ি' হবার জন্য। সে কারখানা তো আটকানো গেছে, তাই বলে কি কলকাতার তথা পশ্চিমবাংলার রাস্তায় গাড়ি/বাইকের সংখ্যা কমানো গেছে? সিঙ্গুরের একটা কারখানা পুরো পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মানচিত্র বদলে দিত একথা কোনো উন্মাদও বলত না, কমরেডরাও বলেন নি। তাঁরা যেটা বলছেন, এবং এখন অনেক কমরেড বিরোধীরাও যা বলছেন সেটা হল, টাটাদের মতো নামী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবাংলায় এলে তা অনুঘটকের কাজ করত, অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণ করত। সম্পাদকমশাইয়ের মনে হয় ধারণা 'কৃষকের ছেলে কৃষক হবে?' প্রশ্নটা কৃষিকাজ 'ছোট কাজ' বলে!

কৃষকের সব ছেলেরা কৃষিকাজে গেলে জমি ভাগ হতে হতে লাভজনক আর থাকে না। কৃষকের ছেলেদের অধিকাংশকেই তাই কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য কাজের খোঁজে বেরোতে হয়। তাদের কাজ দেবার জন্যই চাই শিল্প।

সম্পাদকমশাই একটি প্রশ্ন তুলেছেন কমরেডরা কেন যৌথ খামার গড়লেন না? অন্যভাবে দেখলে বলতে হয় তাঁর প্রশ্ন এই ধনতান্ত্রিক দেশে কেন একটি সাম্যবাদী অঞ্চল তৈরি করা হল না। হায়, তিনি কি জানেন না, লাল দেখলে খ্যাপা ষাঁড় হয়ে যাওয়া তার মতো লোকের অভাব এদেশে নেই!

নমস্কারান্তে ইতি

বিনীত

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

উমা

সংগঠন সংবাদ

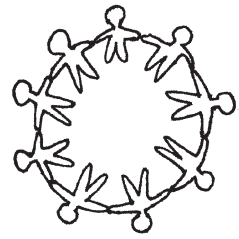

প্রতিবেদনধর্মী লেখা চাই

‘উৎস মানুষ’ পত্রিকা ও সংগঠনের সঙ্গে আমাদের ‘আত্মিক’ সম্পর্ক। এই পত্রিকা সেই ১৯৮০ সাল থেকে আমাদের ‘পুঁথিপত্র’ বিজ্ঞানশিক্ষার বাইরে গিয়ে নানা আন্দোলনধর্মী কাজ শিখিয়েছে। ৯০-এর দশকে আমরা চুঁচুড়ায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিতকুমার দাস, প্রদীপ দত্ত, সুজয় বসু, স্বপন সেনদের এনে নানা কর্মশালা করে শিখেছি, ছাত্রদের শিক্ষিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। ৮০-৯০-এর দশকে মোবাইল ফোন বা ডিজের উৎপাত ছিল না, সাধারণ মানুষকে শিক্ষামূলক কিছু বললে, তা শুনতে বা দেখতে আসতেন। বর্তমানে গ্রাম-শহরের পার্থক্য ভুলিয়ে দিয়ে ‘মোবাইল’ রাজত্ব করছে। সাংস্কৃতিক-সামাজিক মূল্যবোধ একেবারে তলানিতে আছে। ‘মোবাইল ফোন’ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে সৃজনশীলতা বিজ্ঞানবোধ সামাজিকবোধ রয়েছে, সেগুলিকে একেবারে শেষ করে দিচ্ছে। আমাদের বয়স যখন ২৪-২৫ বছর, তখন আমরা উৎস মানুষের আড্ডায় নানা স্বাদের আলোচনা শুনে নিজেদের উদ্দীপিত করতাম। তাই আটজন কিশোর-যুবক মিলে গণেশের দুধ খাওয়ানোর প্রতিবাদে সেইদিনই আমরা সরাসরি প্রতিবাদে নেমেছিলাম। আমাদের ওপর ধ্বজাধারীরা আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল, তবু আমরা থামি নি। ওইদিনই আমরা তদানীন্তন বিধায়কের বাড়িতে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে ডুমুরগাছের অলৌকিক কাজ নিয়ে আমরা সরাসরি প্রতিবাদে নেমেছিলাম। আমাদের সঙ্গে কিশোর-তরুণদের মধ্যে শ্রম তৈরি করতে সাহায্য করেছে ‘উৎস মানুষ’। ‘এটা কী ওটা কেন?’ বইটি আমাদের যুক্তিবাদী মন তৈরি করতে সাহায্য করেছে। আমরা চাই যে, একদিনের জন্য হলেও উৎস মানুষের আড্ডা গ্রাম-শহরে হোক। উৎস মানুষ পত্রিকার খাদ্যে ভেজাল ধরার পদ্ধতি ও আইন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হোক। আগের মতো বিজ্ঞানমনস্ক নাটক ছাপা হোক। এই বাংলায় নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন ক্লাব বা সংস্থা নানা কাজ করে চলেছে, সেগুলিকে আবার ‘সমন্বয়’ করা হোক।

যুক্তিবাদের/বিজ্ঞানমনস্কতার গান প্রকাশ করা হোক, বর্তমান কঠিন সময়ে সাধারণ মানুষকে গান-কবিতার মাধ্যমে বোঝাতে হবে। ‘উৎস মানুষ’-এ ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য নানা স্বাদের লেখা চাই। খুব সহজে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কীভাবে স্বাস্থ্য উদ্ধার ও স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়, তার ওপর বিশেষ বর্ণনা চাই। রক্তদান ও মরণোত্তর দেহদানের নানা সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদনধর্মী লেখা চাই।

প্রদীপকুমার দত্ত,
সম্পাদক, কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা
চুঁচুড়া ৭১২১০১

দেবীপ্রসাদ রায় প্রয়াত

গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যার উৎস মানুষ-এই দেবীপ্রসাদ রায়ের ‘সত্যেন্দ্রনাথ বসু— হর্ষে ও বিষাদে’ শীর্ষক লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে। হঠাৎ করেই প্রয়াত হলেন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক দেবীপ্রসাদ রায়, গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯। নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। মানবতাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র ‘পুরুগামী’-র সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ ছিল। উনি ছিলেন পত্রিকার পুরনো লেখকদের একজন। মাঝে কয়েক বছর তেমন যোগাযোগ ছিল না। গত বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে এসেছিলেন। সেখানেই আবার পুরনো সম্পর্ক জোড়া লাগে। ওঁর হঠাৎ প্রয়াণে আমরা এক সুলেখক ও চিন্তাবিদ মানুষকে হারালাম। প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কেন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি তা নিয়ে ওঁর বিপুল ক্ষোভ ছিল। ‘সত্যেন্দ্রনাথ বসু চেনা বিজ্ঞানী অজানা কথা’ বইটিতে তা নিয়ে সবিস্তার লিখেছেন। মানবতাবাদী আন্দোলনের পুরোধা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন ও কাজ নিয়েও ওঁর প্রভূত চর্চা ছিল।